বাংলা নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্র

(নির্বাচিত আটটি নাটকের ভিত্তিতে)

এম.ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষকঃ রিঙ্কু প্রামাণিক

পরীক্ষার ক্রমিক নম্বরঃ MPBE194013

ক্লাস রোল নম্বরঃ ০০১৭০০১০৩০১৪

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১২৮৭৮৪ (২০১৪-১৫)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

মুখবন্ধ

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। যাদের মধ্যে অন্যতম হল প্রতিবন্ধী চরিত্র। 'প্রতিবন্ধী' শব্দের অর্থ বাধাপ্রদ অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার দেখা যায় প্রতিনিয়ত এরা বঞ্চনার শিকার- এই সকল ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে নাট্যকারেরা নাটক রচনা করলেন। নাটক মূলত সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সেই সমাজের অন্যতম একটি অংশ হল এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও এই অপূর্ণতাকে নিজের বিকাশের পথে বাধা মনে না করে তাকে জয় করে এগিয়ে চলেছেন কেবলমাত্র মনের জোরে- তা আমরা অনেকেই জানি না। একটি বিশেষ অঙ্গের বৈকল্য তার অন্যান্য অঙ্গকে বিকল করে না। যে অন্ধ সে অনুভবে প্রখর, আর তার দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার অন্যদিকে রয়েছে সুতীব্র ঘ্রাণশক্তি- কেউ ভালো গান গায়। কেউ জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের পথ খোঁজে। আবিষ্কার করে অন্যতর জীবন দর্শন। বুঝিয়ে দেয়, একটি অঙ্গের বৈকল্য সত্ত্বেও সে পরিপূর্ণ মানবিকতা সম্পন্ন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল (বাংলা) তে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করব। সেই সূত্রেই গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি- 'বাংলা নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্র'। যার মধ্যে দিয়ে নাটকে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান এবং জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গবেষণাকে পরিপূর্ণ রূপ দানের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দিয়েছেন আমার পথপ্রদর্শক ডঃ শেখর সমাদ্দার মহাশয়। উনার সুচিন্তিত পরামর্শ, উৎসাহ, আন্তরিকতা ও অকৃপন সহযোগিতা আমার এগিয়ে চলার সাহস ও শক্তির উৎস। এছাড়াও নাট্য শোধ সংস্থানের সদস্যা ছন্দা সমাদ্দার এবং আমার বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকেরা আমার গবেষণার কাজে যথাযথ ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার প্রিয়জন, সকল সহপাঠী যাঁদের কাছে আমি নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়েও ঋণ স্বীকার হয় না।

তাং -

বিনীত

রিঙ্কু প্রামাণিক

সূচিপত্র

ভূমিকা:..... ১ - ৯

প্রথম অধ্যায় : নাটকের বিষয়বস্তু ও শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী

চরিত্রগুলির গুরুত্বঃ রচনা ও নির্মাণে..... ১০ - ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রের বর্গীকরণ..... ২৮ – ৪০

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রের অভিনয়..... ৪১ - ৬০

চতুর্থ অধ্যায় : বাস্তব জীবন ও থিয়েটার জীবনে প্রতিবন্ধী চরিত্রের তুলনা..... ৬১ - ৮১

উপসংহার :..... ৮২ - ৮৬

গ্রন্থপঞ্জি :..... ৮৭ – ৮৮

ভূমিকা

একটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন সবারই কাম্য। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কেউ কানে শোনে না, কেউ চোখে দেখে না, কারো আচরণ বা দেহের গঠন স্বাভাবিক নয়। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে ইমপেয়ারমেন্টের কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হল Disability বা প্রতিবন্ধকতা। ইমপেয়ারমেন্ট হল দেহের কোন অংশ বা তন্ত্র যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ী ভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায় সে অবস্থাটিকেই বোঝায়।

প্রতিবন্ধকতার প্রকারভেদ বিভিন্ন ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. কখন শুরু হয়েছে তার ভিত্তিতে -

প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতাঃ- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহন করলে তাকে প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।

পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধকতাঃ- জন্মের পরে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধকতা বরণ করে থাকলে তাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।

২. কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে –

ক) অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী

ঘ) বাক প্রতিবন্ধী

ঙ) বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী

চ) বহুবিধ প্রতিবন্ধী

৩. মাত্রা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাকে চারভাগে ভাগ করা যায় –

ক) মৃদু

খ) মাঝারি

গ) তীব্র

ঘ) চরম

সমাজ উন্নত হচ্ছে, ক্রমশঃ শিক্ষা-প্রযুক্তি-বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার ঘটছে। গ্রাম থেকে শহরে প্রতিনিয়ত নিরক্ষরতা ও কু-সংস্কার দূরীকরণ কর্মকাণ্ড চলছে- তবু আজও সমাজের কোণে কোণে চেপে বসে আছে নানা অশিক্ষা-অসচেতনতা ও কু-সংস্কারের জগদ্দল পাথর। আজও কোনো কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে পালস্ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচী চলার সময় শিশুদের ঐ টিকা দেবেনা বলে গ্রামের লোক বেঁকে বসে- তাদের বক্তব্য তারা মাতব্বরদের কাছে জেনেছে ঐ টিকা খাওয়ালে নাকি শিশুর সর্বনাশ হবে- যৌনক্ষমতা কমে যাবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা নানাভাবে বোঝানোর পর হয়তো এর সমাধান কিছুটা হয়। ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন- কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি পিতা-মাতার সচেনতার অভাব শিশুর প্রতিবন্ধকতা বা বিকলাঙ্গতার করণ। এর জন্য দরকার সুস্থ শিক্ষা ও সচেতনতা। আরও এক পিতা-মাতার ঘটনা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

তাদের একমাত্র সন্তান জন্ম থেকেই ল্যালাখ্যাপা- জড়বুদ্ধি, মাথাটা অস্বাভাবিক মোটা- চোখদুটি অস্বাভাবিক, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেই সন্তান নিয়ে তাদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। ডাক্তার-বদ্যি করে তারা সর্বশান্ত। একদিন সন্ধ্যেবেলা তারা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে দ্রুতগামী এক্সপ্রেসের অপেক্ষায়। ট্রেনটি সামনে এলেই বাচ্চাটিকে লাইনে ছুঁড়ে দেবে বলে। ট্রেন আসে। চলে যায়। মায়ের প্রাণ তো ! ঐ স্নেহের পুত্তলিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে পারে না। দু'জনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। ফিরে আসে সন্তানকে নিয়ে। তারপর সেই সন্তানকে একটি হোমে দিয়ে আসে। এও এক সমাজের বাস্তব ছবি। এই সমস্ত ঘটনাকেই নাট্যকারেরা নাটকের মধ্যে তুলে ধরেন। এই ঘটনার-ই কিছুটা মিল আমরা নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। পার্থক্য এটুকুই – 'উল্কা'-তে পিতা তার সন্তানকে মাতার অজান্তেই নিজেদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। বিকলাঙ্গ সন্তানদের নিয়ে সমাজ-পরিবারে যে কি সমস্যা- তার চিত্র সাহিত্যের নানান স্থানে লক্ষ্য করতে পারি।

'প্রতিবন্ধী' বা 'Disability' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আগে 'বিকলাঙ্গ' বা 'Handicapped' বোঝানো হত। বর্তমানে সমাজবিদগণ 'বিকলাঙ্গ' বা 'প্রতিবন্ধী না বলে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি' a person of special need' বলে থাকেন। কেউ বলেন 'Differently abled' শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষমতা বা দুর্বলতার করণে এই সব মানুষের একটি 'বিশেষ চাহিদা' থাকে। তাদের তথাকথিত এই দুর্বলতার কারণে সমাজের মূলস্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। পরিবারে সমাজে দেশে কালে তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা পায়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি প্রতিনিয়ত এরা বঞ্চনার শিকার। আমাদেরই পরিজন- প্রতিবেশী 'ধৃতরাষ্ট্র', 'পাণ্ডু', 'বৃহন্নলা', 'অষ্টাবক্র' তাদের অঙ্গ বৈকল্যের কারণে কেবলই উপহাসিত শোষিত নির্যাতিত হয়ে এসেছে। সমাজ-নির্বাসিত স্বজনহারা এই সব মানুষ নিজেদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি, ভুগেছে অস্তিত্ব সংকটে। এদের কথা তেমন সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা হয়নি। সমাজের মানুষ যদি

‘অন্ধের যষ্টির মত’ হতে পারতেন তবে এদের সুস্থ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভব হত। প্রতিবন্ধী মানুষজন সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারতেন। এইসব নানা প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন নরনারী বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। নানা গল্পে নাটকে এদের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা বা বিকলাঙ্গতাকে সমাজের অভিশাপ রূপেও দেখা হয়েছে। ‘নানা দেশে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে রয়েছে বহু কলঙ্কিত অধ্যায়। রোম দেশে একসময় দৃষ্টিহীন শিশুদের মাটির পাত্রে শুইয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হত টাইবার নদীতে। এথেন্সে বিকলাঙ্গদের খাবার না দিয়ে মেরে ফেলা হত। স্পার্টায় তাদের উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হত। চার্লস ডারউইন তাঁর ভ্রমণ কাহিনি ‘Voyage of the beaugle’ এ বলেছেন, দক্ষিণ আমেরিকা উপকূল দিয়ে জাহাজ যাবার সময় তিনি দেখেছিলেন, প্রতিবন্ধী অসুস্থ এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের লোকালয় থেকে সার দিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পালাবার দৃশ্য; এবং তাদের পিছু পিছু ঘাতকের ভূমিকায় খড়্গ হাতে উদ্ধত উন্মাত্ত ‘সুস্থ’ মানুষের দল! জাপানে অন্ধদের মারা হত তীর ছুঁড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের T-4 আইনের সাহায্যে নির্বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে হিটলারের ভাষায় ‘useless eaters’ বা অপ্রয়োজনীয় খাদকদের। সে সময় হাজার হাজার প্রতিবন্ধী মারা গেছে হয় গুলি খেয়ে না হয় বাধ্য হয়ে গ্যাস চেম্বারে ঢুকে।’ (‘ওদের কথা ভাবুন’, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সানন্দা, ১লা ডিসেম্বর ২০০২)

আমাদের ভারতবর্ষেও অতীতে এরকম হত্যার কথা জানা যায়। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে লোকসভায় পাশ হয় একটি বিল, ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি যা ‘Disability Act 1995’- The persons with Disabilities (Equal opportunity, promotion of Rights and Full Participation) Act 1995’ নামে পরিচিত। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানে সবার মৌলিক

অধিকার ভোগের কথা বলা হলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা রাখা হয় নি। ১৯৭১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আইন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে সরকারি কাজে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের মধ্যে শতকরা তিনভাগ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। ১৯৮১ সালে গঠিত হয় 'Disabled Persons (Security and Rehabilitation) Bill'। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত করে তোলা, বেকারদের নাম নথিভুক্ত করা, চাকরিতে পদ সংরক্ষণ, এমনকি ষোলো বছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা ও নানা কল্যাণমুখী আইন বলবৎ করা। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা ভেবে, নারী ও শিশু প্রতিবন্ধীদের কথা ভেবে, তৈরি হয় National Trust.

৩রা ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছেঃ প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর দিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালিত হয়। প্রতিবন্ধী দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি বোঝা এবং প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সসম্মানে, নিজেদের অধিকারকে সুরক্ষিত রেখে ভালোভাবে থাকার জন্য সহযোগিতার পরিস্থিতি তৈরি করা। গত ২০০৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের ইউ.এন.এনেবেল প্রচারিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের মূল ভাবনা ছিল 'রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিসেবিলিটিজ অ্যাকশন ইন ডেভেলপমেন্ট'। এই থিমের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে হলে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা এবং তাঁদের মূল স্রোতের কর্মকাণ্ডের অংশীদার করে তোলার গুরুত্ব প্রচার করা।

এই সব দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষজন সমাজে কেবলই উপহাসিত, শোষিত হয় নানাভাবে। 'গোটা মানুষের মানে' খুঁজে খুঁজে তারা হয় ক্ষতবিক্ষত। দরদী লেখকর নিপুণ পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে সামাজিক অবস্থান ও অস্তিত্ব সংকটের বাস্তব চিত্র। এর ফলে চিরায়ত বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, দেখা গেছে তার পৃথক পথগামিতা। পাঠকসমাজকে ভাবিত করেছে, ধরা পড়েছে লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা। জীবনে জীবন যোগ করা এবং শৌখিন মজদুরি নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে, কিন্তু এই সব রচনায় প্রতিবন্ধী মানুষজনদের বাস্তব ছবি দেখলে সাহিত্য সমাজ ও স্বকালের কাছে যে দায়বদ্ধ- সে কথা প্রমাণিত হয়।

নাটক আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে বিশাল স্থান দখল করে আছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। আমাদের জীবনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেরণা-ক্ষোভ সবকিছুই প্রতিফলন ঘটে নাটকের মঞ্চে। জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ছোট ছোট গল্পগুলোই অভিনয়শৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া মঞ্চ নাটকের মূল উদ্দেশ্য। নাটক জীবনের কথা বলে। নাটক হচ্ছে সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কখনো কখনো সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় নাটক। সামাজিক অনাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও কুসংস্কার নিয়ে তৈরি নাটক আমাদের সমাজকে সব সময়ই নাড়া দিয়েছে, পরিবর্তন এনেছে সমাজ মননে। কিন্তু নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিকে দেখা যায় তারা তো সব কল্পিত চরিত্র। বাস্তবের ছবিকে নাট্যকারেরা কল্পনার মৌহজালে বাস্তবোত্তর করে তোলেন এবং প্রতিবন্ধী বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাহলে কেনই বা এই সকল প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নাট্যকার লিখতে গেলেন ?

যে কোনো নাটকের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার দর্শক এবং সমাজকে কোন না কোন বার্তা দিয়ে থাকেন। বাংলা যে সকল নাটক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নাট্যকারেরা রচনা করেছেন, সেখানে

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নানান দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, সমাজ জীবনে এই সকল ব্যক্তিদের অবস্থান নাটকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি 'বাধাপ্রদ' অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানান ক্ষেত্রে নানান বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এমনকি সমাজের চারপাশের মানুষজন এদের দিনের পর দিন অগ্রাহ্য করেই চলেছে ফলত তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতরে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী হলেও মনের দিক দিয়ে এরা প্রতিবন্ধী নয়। একটি অঙ্গের বৈকল্যের ফলে সমাজ এদের অচল মনে করলেও এই সকল প্রতিবন্ধীদের অন্য অঙ্গগুলি যথাযথ ও পরিপূর্ণ ভাবে সক্ষম হয়ে ওঠে, যাকে কেন্দ্র করেই প্রতিবন্ধীরা তাদের অক্ষম অঙ্গটির চাহিদা পূরণ করে এবং নানান বাধা-বিঘ্ন জয় করে মাথা উচু করে এগিয়ে চলেন। যার অসংখ্য উদাহরণ আজও বর্তমান। প্রথমদিকে যখন নাটক অভিনীত হত, তখন দেখা যেত নারী চরিত্রে পুরুষেরা নারীর ছদ্মবেশ ধারন করে নারী চরিত্রে অভিনয় করত এবং নাটকের মূল ভাবনা দর্শক সাধারণের কাছে পৌছে দেবার চেষ্টা করত।কিন্তু তবুও এই ছদ্মবেশী পুরুষ চরিত্রে যথাযথ ভাবে নারীত্বকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না। তাই কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে ছদ্মবেশী ভাবনার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করে চলেছে। ঠিক তেমনি প্রতিবন্ধী চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও মূলত বাস্তবের প্রতিবন্ধিকতা যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে অনেক প্রযোজনা বর্তমানে নাটক করে চলেছে। যার ফলে প্রতিবন্ধী চরিত্রযুক্ত নাটকটিতে প্রতিবন্ধীদের ভাবনা ও অবস্থান নাটকে উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অসাধারণ, যাদের খবর আমরা জানি না। অনাদরে, অবহেলায় তারা কালের আবর্তে হারিয়ে গেছেন। নাটকের মধ্যে দিয়ে তারা যেমন মনের খোরাক মিটিয়েছে, তেমনি সকলের সামনে নিজেদের সমমর্যাদার দিকটিকেও উপস্থাপিত করেছেন। ফলত এই সকল প্রতিবন্ধীরা যেমন আর পাঁচজন স্বাভাবিক

মানুষের সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে পাশাপাশি এদের মধ্যে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার মনোভাবও গড়ে উঠেছে।

প্রতিবন্ধীদের যদি শ্রেণীগত দিক দিয়ে বিচার করা যায় তাহলে এদের মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় – শারীরিক প্রতিবন্ধী আর মানসিক প্রতিবন্ধী। উন্নতশীল দেশগুলোর জন্য মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব একটি বড় মনোসামাজিক সমস্যা। আমাদের দেশের মোট মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও এ সংখ্যা যে নেহাতই কম নয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, গড় হিসেবে পৃথিবীর যে কোনো দেশের শতকরা ৩ ভাগ লোক মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী। যদি সে হিসেবেও বিবেচনা করা হয় তাহলে আমাদের দেশের মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩ মিলিয়ন। প্রকৃতপক্ষে মানসিক প্রতিবন্ধী বলতে আমরা তাদের বুঝি যাদের বুদ্ধাঙ্ক কম। এদের মানসিক বিকাশ যে কোনো কারণেই হোক তীব্রভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং এরা সামাজিক ভাবেও বেশ মানবেতর জীবন যাপন করে। মানসিক বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব তীব্র থেকে মাঝারি বা অল্প মাত্রার হতে পারে। আর যারা স্বাভাবিক ব্যক্তিদের থেকে শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম এবং পিছিয়ে আছে তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী বলা হয়। গবেষণার বিষয় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে হলেও এখানে কেবল শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষন করা হবে, মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নয়। কারণ একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী স্বভাবতই পিছিয়ে আছে। সামাজিক জীবনেও তার নানান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি অঙ্গের বৈকল্যযুক্ত বা আংশিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন নরনারীরা অনুভবের জগতে যে কোনো সুস্থ দেহমনের মানুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়, এমনকি আমাদের চারিপাশে এমন অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে যারা তাদের প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়েও ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে

কেবলমাত্র মনের জোরে। তাদের জীবনচর্চার দলিল হয়ে ওঠে এই সব সাহিত্য ও নাটক। আমার আলোচনার প্রয়াস হল, সেই সব হীরকখণ্ডগুলির ঔজ্জ্বল্য ও প্রভা পুনরাবিষ্কার।

প্রথম অধ্যায়

নাটকের বিষয়বস্তু ও শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির গুরুত্বঃ রচনা ও নির্মাণে

সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ নাটক। সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যে থাকে জীবন সমালোচনা। নাটকে আরও বলা হয় সমাজের দর্পণ। থিয়েটারের মূল বিষয় সামাজিক ঘটনা, তার ঘটনা বিন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু সমাজ ব্যবস্থা। কোন সময়েই থিয়েটার সমাজ বহির্ভূত নয়। নাট্যকার যেমন মঞ্চায়নের কথা ভেবেই নাটক লেখেন, তেমনি নাট্য পরিচালকও দর্শকদের কথা চেতনে-অবচেতনে ভেবেই নাটক পরিচালনা করেন। ফুল আপনিই ফোটে কতশত, কিন্তু মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশ। নাটকে অভিনীত জীবন কথা ও দর্শকদের জীবন চেতনায় গ্রহণ-বর্জনের দ্বারাই সার্থক হয়ে ওঠে। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ যার কাছে রাত দিন সমান। যিনি বাক প্রতিবন্ধী মানুষ তার সবকিছুর অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতে পারেন না। আবার একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষ যিনি সবকিছু দেখতে পেলেও পৃথিবীর কোন শব্দই শুনতে পায় না। আমাদের সমাজে এমন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ বাস করেন যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবহেলিত অথচ ক্ষেত্র বিশেষে তারাও যে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম তা আমরা অনেকেই জানি না। এমন কি হয়তো তারা নিজেরাও জানেন না। তাদের মানসিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, তাদের সমাজের সামনে তুলে ধরা দরকার। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো। নাটক- চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

বিভিন্ন প্রযোজনাই স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হয়েছে এবং মঞ্চ সাফল্যও পেয়েছে। কিন্তু শারিরিক দিক দিয়ে যারা অক্ষম, যাদের সমাজ এমনকি পরিবারও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা দেয়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি প্রতিনিয়ত এরা বঞ্চনার শিকার। এই সকল ব্যক্তিদের জীবনকে নিয়ে নাট্যকারেরা নাটক রচনা করলেন। যে কোনো নাটক সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সেই সমাজের অন্যতম একটি অংশ হল এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। যারা বিকলাঙ্গ হয়েও এই অপূর্ণতা নিজের বিকাশের পথে বাধা মনে না করে তাকে জয় করে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে তাদের নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবুও তারা শেষ পর্যন্ত অন্ধকার কাটিয়ে আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে। নাট্যকারেরা তাদের এই জীবন যুদ্ধের বীরত্বকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

বাংলা নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি আছে তাদের বিশেষত্বগুলি ক্রমপর্যায়ে আলোচনা করা হল- বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬) নাটকটি লেখেন গণনাট্য আন্দোলনের সময়ে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬১, পনেরো বছর ধরে একই মরাচাঁদ নাটক তিনি বিভিন্ন ভাষ্যে লিখে গেছেন। এই নাট্যবস্তুটির ক্রমরূপান্তরে একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিগত একটি যন্ত্রণাকে তিনি ক্রমে ক্রমে এক জাত শিল্পীর বাস্তব জীবন ও শৈল্পিক অঙ্গীকারের দ্বন্দ্ব ও সংস্কৃতিক উৎপাদনের সেই পরিমণ্ডলে নিয়ে গেছেন যেখানে শিল্পী, নিজ জীবনের সংকটের উত্তরণ ঘটান দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত কোন সৃষ্টিতে। এই গল্প, নানা গল্প বলা উচিত হবে না। বলা ভালো ঘটনা। এই ঘটনা পবনকে নিয়ে। পবন অন্ধ, জন্ম থেকেই তার দুটো চোখ-ই অচল। সে চোখে দেখতে না পেলেও তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আছে- যা তাকে অন্য মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেছে। সে খুব ভালো গান গায়। নিজেই গান বাধে আর নিজেই গায়। এই গান-ই পবনের সব ছিল। কিন্তু তার জীবনে যখন রাধা এলো তার পর থেকেই আসতে আসতে যেন তার প্রানের গান হারিয়ে যেতে থাকে। পবন এক সুন্দরি বউ

বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। কারণ তার ইচ্ছে ছিল- তার সুন্দরি বউকে দেখে গ্রামের সবলোক হা করে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের সেই চোখ দিয়ে অন্ধ পবন দেখতে পাবে তার স্বপ্নগুলোকে। পবন দেখবে তার মনের চোখ দিয়ে। কিন্তু বিয়ের পর তার বউ অন্য পুরুষদের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। রাধা অর্থাৎ পবনের বউ ভেবেছিল স্বামী অন্ধ হওয়ায় সে তার কুকর্মের কথা বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে প্রতিবন্ধীদের একটি অঙ্গ অক্ষম হলেও অন্যান্য অঙ্গগুলি অত্যান্ত সচল থাকে। যা তাকে আর পাঁচজন সাধারন মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ক্ষমতার অধিকারী করে রাখে। পবন-রাধার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বউ-এর কুকর্মের কথা বুঝতে পারে এবং বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। শচীন পাড়ার সভায় পবনকে গান, তার ঘর বাধার গান করতে আমন্ত্রন করে। কিন্তু পবন তাকে জানিয়ে দেয় সে আর গান করতে পারবে না। তার গান সব ভেঙে গেছে। কিন্তু শচীন তাকে সমাজ থেকে এভাবে হেরে যেতে দেয়নি। সে পবনের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মিয়েছে এবং তেকে গান গাইতে উৎসাহিত করে। কারণ শচীন জানতেন গান-ই পবনের স্বপ্ন ও জীবন, যাকে কেন্দ্র করে সে আরো বড় হতে পারবে। শেষে পবন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার এগিয়ে চলা এবং উন্নতির স্বপ্ন দেখতে থাকে। সুতরাং পবন অন্ধ হলেও সে কিন্তু আশাবাদী, যা বাস্তবে রূপ পাবে তার চমৎকার গানের মধ্যে দিয়ে।

দেবনারায়ণ গুপ্তের 'শ্যামলী'(১৯৫৩) নাটকে বোবা-কালা শ্যামলীর জীবনকথা ফুটে ওঠে। শ্যামলী শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী হলেও প্রকৃতির রূপ আস্বাদন থেকে কিন্তু সে বঞ্চিত নয়। বাড়ির ছাদের উপর উঠে প্রত্যাহ সে আকাশের বর্জ্যবিদ্যুৎ সহ মেঘের যে রূপ তা উপভোগ করে। এক্ষেত্রে সে কারো বাধা মানে না। অর্থাৎ বলা-ই যেতে পারে শ্যামলী প্রতিবন্ধী হলেও সে যে সৌন্দর্যের পূজারী। ভাগ্যের পরিহাসে এবং সামাজিক কুসংস্কারের চাপে পড়ে তার বিয়ে হয় উচ্চ পরিবারের শিক্ষিত যুবক অনিলের সাথে। অনিলও তাকে সস্নেহে গ্রহণ

করে নেয়। নাট্যকার এখানে দেখাতে চেয়েছেন, শ্যামলী বোবা-কালা হলেও সে কিন্তু অনুভব করতে পারে; বঝতে পারে সমাজ, পরিবার তাকে কি বলতে চাইছে। কিন্তু তা হলেও অনিলের মা সরলা তাকে মন থেকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমনকি শ্যামলীর মা-বাবাও তাকে তাদের পূর্বকর্মের পাপ বলেই মনে করেন। শ্বশুরবাড়িতে গেলেও শ্যামলীর মন তার নিজের বাড়ি ও মা-বাবার দিকেই চেয়ে থাকে। এখানেই শ্যামলী আর পাঁচজন স্বাভাবিক নববধূর সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এমনকি পাড়ার দরিদ্র ছেলেমেয়েরা যখন তাকে পাগল মনে করে তার পিছনে লাগে তখন কিন্তু শ্যামলী ছেলেদের বিরক্তের হাত থেকে বাঁচা এবং খিদে মেটানোর জন্য তাদের হাতে খাবার তুলে দেয়। অর্থাৎ এখানে শ্যামলীর মানবিক দিকটিও যথাযথ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু অনিলের মা সরলার একটাই কথা কালা-বোবা মেয়েকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না, সে অনিলের নতুন করে বিয়ে দেবার কথা ভাবে। অনিল তাকে ভাগ্যের পরিহাস বললেও তার মা নিজের কথায় অনড় এবং সরলা অনিলকে মা মরার দিব্যি দিয়ে বসে। এরই মধ্যে অনিল শ্যামলীকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে যায়। নারায়ণী এবং পীতাম্বর তাদের দেখে অবাক, কারণ তারা তো তাদের অষ্টমঙ্গলায় নেমন্তন্ন করেননি। কোন মুখেই বা করবেন! শ্যামলীর মা-বাবা তাদের আসা দেখে খুব আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু অনিলের আসার কারণ- শ্যামলীকে বাপের বাড়ি রাখতে আসা। পীতাম্বর অনিলের কষ্ট দেখে তাকে নতুন করে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেও অনিল স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। শ্যামলী বোবা-কালা হলেও অনুভবের মাধ্যমে তার বাবাকে সে আদর করে এবং ইশারার মাধ্যমে সে দেখানোর চেষ্টা করে- অনিল খুব ভালো মানুষ। নারায়ণী যখন অনিলের জন্য মিষ্টি আনলো, সে খেতে না চাইলেও শ্যামলী কিন্তু জোর করে আরো মিষ্টি খাইয়ে দেয় এবং অনিল যখন চলে যায় শ্যামলী তখন হাটু গেঁড়ে অনিলকে প্রণাম করে। সুতরাং বলাই যেতে পারে, প্রতিবন্ধী হলেও শ্যামলীর মধ্যে আর পাঁচজন গৃহবধূর মতোই স্বামীর প্রতি চিন্তা-

ভাবনা-শ্রদ্ধা বর্তমান। শ্যামলীকে অনিল বাপের বাড়ি রেখে আসলেও সরলা তবু অনিলের নতুন করে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেই চলেছে। কারণ সরলা মনে করেন শ্যামলী কালা-বোবা, সে আবার কি করে সংসার করবে। কিন্তু 'যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না,' একটি অঙ্গের বিকৃতি মানে পূর্ণ বিকৃতি নয়। শ্যামলী বোবা-কালা কিন্তু তার অনুভব ক্ষমতা আছে, আছে কান্না-হাসি, প্রেমবিরহ,সুখ-দুঃখ। ইতি মধ্যে সরলা তীর্থযাত্রা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মা মরা মেয়ে রেবাকে তার সাথে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে। আর এদিকেও শ্যামলীর মা মারা যায়, শিশির একথা পীতাম্বরের মুখে শুনতে পান। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষমতাও যে শ্যামলীর রয়েছে তা শিশিরকে চা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়। অনিলের ছবি দেখে শ্যামলী যে নিজের মাথায় ঘোমটা টেনে নেয়- এই সকল দৃশ্য দেখে শিশির হতবাক। বাড়িতে আর কেউ না থাকায় সন্তান সম্ভবা মা হারা বিজলীকে শিশির নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। সুতরাং শ্যামলী পুরো একা হয়ে পড়ে। শিশিরের মুখে শ্যামলীর কষ্টে জীবনযাপনের কথা শুনে অনিল আর স্থির থাকতে পারলো না। তৎক্ষণাৎ সে শ্যামলীকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য বেরিয়ে পড়ল। এদিকে রেবা বৌ হতে পারলো না বলে কিন্তু সে আর কষ্ট পেল না,পাছে সে শ্যামলীকে নিজের হাতে গৃহকর্মে নিপুণ করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। শ্যামলী শ্বশুর বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই সরলা অর্থাৎ তার শাশুড়িকে পায়ে হাত দিয়ে হাটু গেঁড়ে প্রণাম করলো।এই প্রণামের মধ্যে দিয়ে যথার্থ ভাবেই আমরা বুঝতে পারি- সরলা এই সংসারের প্রধান এবং শ্যামলীকে তার নিচে অর্থাৎ পায়ের তলায় থাকতে হবে। সুতরাং শ্যামলী প্রতিবন্ধী হলেও তার মধ্যেও যে বোধশক্তি রয়েছে তা যথার্থ ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

একজন যথার্থ মানুষের পরিচয় ও তার ব্যবহার তার শারীরিক রূপ, আকার ও গঠন দিয়ে বিচার করা যায় না। খাঁটি মানুষ তার কর্ম ও গুনের মধ্যে দিয়ে সকলের কাছে মর্যাদার আসনে ভূষিত হন। এই রকমই একজন খাঁটি মানুষকে আমরা খুঁজে পাবো নীহাররঞ্জন গুপ্তের(১৯১১-

১৯৮৬) 'উল্কা'(১৯৫৪) নাটকটির মধ্যে দিয়ে। যেখানে একজন প্রতিবন্ধী চরিত্র হলেন অরুণাংশু, যে কিনা জন্মমুহূর্তেই পরিপূর্ণ রূপ ও আকৃতি সম্পূর্ণ নয়। সে এতটাই দেখতে কুৎসিত যে তার পিতা তাকে জন্মের পরই পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাকে নিজের পুত্র পরিচয় দিতেও ঘৃণাবোধ করেছেন। তাহলে কি একজন প্রতিবন্ধী সন্তান সমাজে এমনকি তাঁর পিতার কাছেও ফ্যালনা ও অবহেলার পাত্র ? কিন্তু উক্ত নাটকে আমরা দেখব কিভাবে একজন পরিত্যাক্ত প্রতিবন্ধী সন্তান অর্থাৎ অরুনাংশু নিজগুণে একদিন খাঁটি ও যথাযথ মানুষ, সন্তানের মর্যাদায় ভূষিত হন। জন্মের পর অরুনাংশুর স্থান হয় এক অনাথ আশ্রমে বাবা বিরজানন্দের কোলে। সেখানেই সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে এবং একজন দক্ষ বেহালা বাদকে পরিণত হন। যা একজন প্রতিবন্ধীর বিশেষ গুন-ই বলা যেতে পারে। এমনকি বিরজানন্দ মহারাজ অরুনাংশুর এই রূপ ও চেহারাকে ভগবানের লীলা বলে-ই মনে করেন। সময়ের অতিবাহিত হবার সাথে সাথে বিরজানন্দ মহারাজের বয়সও হতে থাকে এবং মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তিনি অরুনাংশুকে দুটি কথা বলে যান। প্রথমত, তাঁর অর্থাৎ বিরজানন্দের মৃত্যুর পর আর কেউ তাকে(অরুনাংশু) তার কুৎসিত চেহারার জন্য এই আশ্রমে থাকতে দেবেনা। দ্বিতীয়ত, অরুনাংশু আশ্রমের অন্য সকলের মতো অনাথ নন। তার পিতা-মাতা এখনও বেঁচে আছেন। যার পরিচয় অরুনাংশু পাবে ডঃ সুহৃৎ সরকারের থেকে।

বিরজানন্দ মহারাজ মারা গেলে অরুনাংশু বেরিয়ে যান তার পিতা-মাতার পরিচয় জানতে। কারণ একজন প্রতিবন্ধী শিশু সে যেমনই দেখতে হোক না কেন- শিশু তাঁর পিতা-মাতার কাছে সবসময় সন্তানের মর্যাদা লাভ করে। তাই রায়বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষ অর্থাৎ অরুনাংশুর পিতা তাঁর রূপবান দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদিনে বাড়িতে থাকতেন না এমনকি তাকে আশীর্বাদ পর্যন্ত করতেন না, কোথাও যেন উনার প্রথম সন্তান অরুনাংশুর মায়া জন্মে থাকতো। এই কষ্টের কথা তিনি স্ত্রীকেও বলেন নি। কারণ উনার স্ত্রী জানতো যে তাঁর প্রথম সন্তান মৃত জন্মেছিল।

অরুনাংশু নিজের মাকে দেখার পর সে একজন পুত্রের দায়িত্ব মায়ের অজান্তেই পালন করেছে। কারণ একজন পুত্রের কাছে তাঁর মা দেবীর সমান। অরুনাংশু প্রতিদিন রাতে সকলের অজান্তেই তাঁর মায়ের চরণের কাছে ফুল রেখে আসতেন, যা একজন মাতৃপ্রেমি ও সৎ সন্তানের পরিচয় বহন করে। অরুনাংশু যখন রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসে উনাকে পিতা বলে ডাকেন, তখনও উনি অরুনাংশুকে পুত্রের পরিচয় দেননি। ফলে চোর সন্দেহে অরুনাংশু জেল হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও অরুনাংশু বড়ো দাদার কর্তব্য পালন করে এবং ছোট ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে অরুনাংশু যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিল তখনও তাঁর কুৎসিত মুখ মাকে দেখাতে চাননি। পাশাপাশি রাজীরনাথও শেষে অরুনাংশুকে পিতৃ পরিচয় দেন এবং নিজের ভুলও বুঝতে পারেন। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে অরুনাংশু তাঁর মায়ের কাছে একটি মাত্র চাওয়া- মা তাকে যেন এই অন্তিম মুহূর্তে একটু কোলে করে আদর করেন। অতএব অরুনাংশু একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক মানুষের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজের ব্যবহার ও কাজের মধ্যে দিয়ে একজন যথাযথ ও আদর্শ পুত্র, ভাই,মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। ফলত যেকোনো মানুষকে তাঁর রূপ ও চেহারা দেখে মনুষ্যত্বের বিচার করা উচিত নয়, তাঁর নিজ গুনের মধ্যে দিয়েই নিজের পরিচয় বহন করে।

জোছন দস্তিদার(১৯৩৩-১৯৯৮) 'দুইমহল'(১৯৫৮) নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রদের তুলে ধরেছেন তারা সমাজের একেবারে নিচুশ্রেনীর অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অনাথ সম্প্রদায়। যারা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজের সঙ্গে অনবরত লড়াই করেই চলেছে। ভিক্ষাবৃত্তি যাদের মূল উপজীব্য। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে যিনি নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থের ভান্ডার বাড়িয়েছেন তিনি হলেন রঞ্জন সান্যাল। এই মুখোশধারী ব্যক্তির অন্য একটি পরিচয় আছে-ইনি হলেন সম্ভ্রান্ত সমাজ সেবক।

নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তারা এক একজন এক এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী। কারও পা খোঁড়া হাত নুলো, কেউ চোখে দেখতে পায় না, আবার কেউ কেউ কথা বলতেই পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা কিন্তু জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী নয়। রঞ্জন সান্যালের মতো বদমাস জোচ্চর কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদের প্রতিবন্ধীতে পরিণত করেছেন এবং তাদের দিয়ে নানান ভাবে ব্যবসা করিয়ে নিয়ে নিজেকে সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শোষিত, নিপীড়িত হলেও তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনবরত ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলেছে। কারণ তারা জানেন ভিক্ষা না করলে মালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের উপর নানান ভাবে শারীরিক অত্যাচার করবেন, এমনকি দুমুঠো ভাত খেতেও দেবেন না। এমনকি প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা এবং তাদের দিয়ে অর্থের আয় বাড়ানোর জন্য গুন্ডাদলের লোকেরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েদের অপহরণ পর্যন্ত করেই চলেছে। এই সকল প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের অন্যতম দুটি চরিত্র হল- মনুয়া ও ওসমানী। তারা ধীরে ধীরে একে অপরকে খুব ভালো বাসতে লাগে এবং সকলের অজান্তেই একটি সন্তানের জন্ম দেয়। তারা নিজেরা নানান কষ্টের মধ্যে থাকলেও কিছুতেই তাদের সন্তানের কোনো ক্ষতি হতে দেননি। এমনকি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে একটি গুপ্ত স্থানে সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাকে নিয়ে তারা খুব খুশি ছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষে হয়নি। গুন্ডাদলের লোকেরা তাদের সন্তানের কথা জানতে পারেন এবং তাদের মালিক রঞ্জন সান্যালকে তার খোঁজ দেন। অত্যাচারী রঞ্জন সান্যাল তার লোকেদের বলেন- বাচ্চাটিকে মেরে ফেলার কথা। কারণ তিনি জানেন সন্তানের মৌহ মনুয়া ও ওসমানীকে এই বদ্ধ, কষ্টের জীবন থেকে বাইরে সাংসারিক জীবনে নিয়ে যেতে পারে। তার ফলে নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে। রঞ্জন সান্যালের ছিল এক মেয়ে ও এক ছেলে। তার মেয়ে অর্থাৎ অপর্ণা সবসময় সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে থাকতে, খেতে, জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। তাই

তার দাদার বন্ধু বারীন রায়ের দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে তাকে বিবাহ করতে চাননি। কিন্তু অপর্ণার দাদা সুবীর উচ্চঘরের সন্তান হলেও সাধারণ মানুষদের সাথে চলাফেরা করতে পছন্দ করতেন। এমনকি একজন সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়েকেও তিনি ভালোবাসতেন এবং তার সঙ্গে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। এমন সময় অপর্ণার বিবাহ ঠিক হয় উচু ঘরের সন্তান কুণাল মিত্রের সঙ্গে এবং রঞ্জন মনুয়া ও ওসমানীকে ছলনা করা তাদের বাড়িতে কাজ করার উদ্দেশ্যে আসতে বলেন। যাতে গুন্ডাদলের লোকেরা বাচ্চাটিকে শেষ করে দিতে পারে। এমনকি নিজের পুত্রবধূকে হত্যা করার জন্যও তিনি লোক পাঠান। ফলত মনুয়া ও ওসমানী নাটকের অন্তিমে যেমন রঞ্জনের ছলনার কথা জানতে পারেন এবং নিজের সন্তানকে বাঁচাতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে সুবীর পিতার কুকর্মের কথা যেমন জানতে পারেন পাশাপাশি ঐই সন্তানের অপহরণের কথাও বুঝতে পারেন। তাই সুবীর শেষে পিতার প্রায়শ্চিত্যের জন্য নিজেই সংসার, ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং মনুয়া ও ওসমানী প্রতিবন্ধী ও অক্ষম হলেও তারা নিজেদের সন্তানের কথা ভেবে সব রকম কষ্ট সহ্য করেছেন। এমনকি সমাজ এবং রঞ্জন সান্যালের মতো বদমাশ, জোচ্চর ব্যক্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়েই গেছেন। একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি যেমন তার সন্তানকে সমস্ত বাধা বিপত্তি থেকে আগলে রাখেন এবং রক্ষা করেন, মনুয়া ও ওসমানীও তাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। সমাজের অনেক মানুষেরা ভেবে থাকেন প্রতিবন্ধী মানেই তারা সমাজ বঞ্চিত এবং অবহেলিত হয়ে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনুয়া ও ওসমানী, যা নাটকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের(১৯২১-১৯৮৪) 'মৌনমুখর'(১৯৬১) নাটকটি একটি প্রহসন ধর্মী নাটক। নাটকে যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ফুটে উঠেছে তার নাম মিনতি দেবী, যে জন্ম থেকেই বোবা কিন্তু কালা নয় অর্থাৎ সে কথা বলতে পারে না কিন্তু সকলের কথা বোঝার ক্ষমতা তার আছে। সে

একজন ধনী ব্যক্তির একমাত্র কন্যা, দেখতে খুবই সুন্দর। যার কারণে অতীন সেন মেয়েটি বোবা জেনেও তাকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। মিনতি দেখতে এতটাই সুন্দর যে অতীন তাকে ডানাকাটা পরি এবং দোম হেওয়া পুতুলের সাথে তুলনা করেছেন। প্রথম প্রথম মিনতির কথা না বলাকে কেন্দ্র করে অতীনের কোনো অসুবিধা না হলেও দিন যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই সে নিজেকে একাকীত্ব বোধ করতে থাকে। এমনকি অতীন তখন মিনতিকে যাদুঘরের মূর্তি বলে তুলনা করেছে- যে কোনো কথা বলে না, কেবল সব সময় চুপ হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র চুরি করে নিত। অতীন পেশায় একজন ব্যারিস্টার হওয়ায় মামলা চলাকালীন সে হঠাৎ মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেনি। তার মূল কারণই হল সংসারে একাকীত্বের মধ্যে থাকতে থাকতে সে যেন বোবাতে পরিণত হয়েছিল।তাই সে তার স্ত্রীকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। এই চিন্তাময় জীবনে মুক্তির আলো দেখিয়ে ছিল সমর। সমর ছিল অতীনের বন্ধু। প্রথমত, সে অতীনের বাড়িতে একটি মামলার কাজ নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, বন্ধুর কথোপকথনের মধ্যে অতীন হঠাৎ তার স্ত্রীর সমস্যার কথা সমরকে জানায়। এই কথা শোনার পর সমর ডঃ কল্যান সেনের কথা জানায়, যিনি ইউরোপে বোবা ব্যক্তিদের সুস্থ করার উপর ডাক্তারি পড়েছেন এবং ঔষধ তৈরি করেছেন। যার ফলে বোবা ব্যক্তিরা পুনরায় সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু মিনতি যখন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেলেন তখন তার আচরণের তুমুল পরিবর্তন ঘটল। যিনি এতদিন কেবল সকলের কথা শুনেই এসেছেন, প্রত্যুত্তরে নিজে কিছুই বলার ক্ষমতা পাননি। মিনতি যে কথা বলার ক্ষমতা পেয়েছে তা দেখে অতীন খুবি উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু পরে তাকে নানান সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ চিকিৎসা হবার পূর্বেই সমর অতীনকে বলেছিলেন – ‘কথা বলা বউ-এর সুবিধাও যেমন, অসুবিধাও তেমনি’। যার মর্মার্থ তিনি পরে টের পেলেন। কারণ মিনতি প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির পরই তার এতদিনের

কথা বলার বাসনা, আবেগ তিনি আর সামলাতে পারেননি। এমনকি উনার চিন্তা ভাবনায় প্রাচীনকালের রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রও তার মধ্যে বশীভূত হয়েছে, যা উনার কথা বলার ভঙ্গি ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। অতীন যখন সমরের মামলার কাগজপত্র পড়তে থাকে তখনই মিনতি তার কাছে এসে উপস্থিত এবং একের পর এক যুগ, একের পর এক মুহূর্ত,দিন,ক্ষণ সমস্ত ঘটনাই অতীনকে বলে যেতে থাকে এবং অতীন তা শুনতে শুনতে তার মামলার কাগজপত্রে ঠিক ভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। একসময় অতীন পাগলের মতো ব্যবহার করতে থাকে এবং মিনতির কাছ থেকে বাঁচার জন্য ছুটে ছুটে পালিয়ে বেড়ায়। এই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য অতীন ডঃ কল্যান সেনকে ডেকে পাঠান এবং মিনতিকে আগের মতো বধির করে তুলতে অনুরোধ করে। ডঃ সেন অতীনকে জানান এটা কোনদিন সম্ভব নয়। কিন্তু একটা উপায় ডঃ সেন বের করলেন। অতীনের কানে তিনি কোফোসিস নামক একপ্রকার পাউডার ঢেলে দেন। যার ফলে অতীন কানে কালা হয়ে যায়। ফলত তিনি আর কারো কথা শুনতে পান না। সুতরাং অতীন বুঝতে পারেন মিনতি প্রতিবন্ধী অবস্থায় অসহায় ও মূর্তিমান হয়ে থাকলেও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির পর মিনতির কথাবার্তার এমন পরিবর্তন ঘটল যে অতীন তা হাড়ে হাড়ে টের পান। তার ফলস্বরূপ তিনি নিজেই কানে কালা হয়ে যেতে বাধ্য হন।

১৯৬৪ সালে প্রথম অভিনীত মনোজ মিত্রের(১৯৩৮-__) একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল নীলকণ্ঠের বিষ। নাটকে দুটি প্রতিবন্ধী চরিত্র ফুটে উঠেছে। একজন লংম্যান, যে খোঁড়া- ক্রাচে ভর দিয়ে চলেন। লংম্যান ছিলেন মিশনারি চার্চের ফাদার। অপর একজন প্রতিবন্ধী চরিত্র হলেন ভিখারি দুখিরাম, সে পঙ্গু- চলাফেরা করতে পারে না। চাকা লাগানো কাঠের বাক্সের মধ্যেই তার শোওয়া বসা সবকিছু। লংম্যান যেহেতু চার্চের ফাদার তাই লোরাকে ভালোবাসাই তার অপরাধ। কারণ মিশনারি নিয়মে চার্চের ফাদারের স্থান ধর্মের সব থেকে ঊর্ধ্বে, তিনি

কোনো নারীর মোহে আসতে পারেন না। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে উনাকে শহর থেকে দূরে জনমানবহীন স্থানে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও পুরনো গির্জায় আনা হয়। কিন্তু ফাদার লংম্যান এই সম্মানের ও বদ্ধ জীবন চায় না। তিনি তার নিজের দেশে ফিরে যেতে চান। সেখানে তিনি সাধারন মানুষের মতো চাষ আবাদ করে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে লোরার সাথে সুখে জীবন কাটাতে চান। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হল না। তাই তিনি সমাজ সেবা মূলক কাজে নিয়োজিত হন। তিনি সমাজের অসহায়, দরিদ্র, ভিখারি মানুষদের নিজের কাছে নিয়ে আসেন। এর ফলে লংম্যানের যেমন একাকীত্ব কাটে তেমনি ভিখারিদেরও সমাজের উচ্চ শাসকশ্রেনী, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং অর্থ উপার্জনের জন্য ভিখারিদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে নেন, সে সকল অত্যাচারী মানুষদের হাত থেকেও বাঁচানো সম্ভব হয়। ফলে লংম্যান প্রতিবন্ধী হলেও অসহায় মানুষদের প্রতি অপর একজন মানুষের যে দায়িত্ব কর্তব্য তা তিনি ভুলে যান নি। এমনকি তিনি নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। যা একজন মানুষের মানবিক ধর্ম। প্রবল ঝড় জলের এক বিকেলে ভিখারিরা, বক্সীবাবু, গির্জার পাহারাদার, এমনকি এক ডাক্তার যখন ঐ গির্জার ভিতরে আশ্রিত তখন লংম্যান নিজের প্রতিবন্ধতার কথা না ভেবে, ঐ অসহায় ভিখারিদের কথা ভেবে বাইরে বেরিয়ে পড়েন খাবার সংগ্রহ করতে। খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসার সময় তিনি নিজের সাথে এক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত বালিকাকে নিয়ে এলেন এবং ঐই গির্জার মধ্যে ঠাই দিলেন। গির্জার যে ডাক্তার আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তিনি লংম্যানকে ঐ মেয়েটির গায়ে হাত দিতে বারণ করেন। কিন্তু লংম্যান নিজের কথা না ভেবে ঐই মেয়েটিকে যত্ন করতে থাকেন। সুতরাং লংম্যান সমাজের কাছে অবহেলিত হলেও তিনি কিন্তু যথার্থ মানবদরদি একজন আদর্শ মানুষ। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে ডাক্তার যখন গির্জা থেকে চলে যান তখন তিনি তার ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে যান। সেই ব্যাগের মধ্যে ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু উল্লেখযোগ্য বই, যাকে কাজে লাগিয়ে লংম্যান এই মানুষগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা

করেন। এমনকি তিনি হাসপাতাল তৈরির স্বপ্নও দেখতে থাকেন। ডাক্তার কিন্তু সেই দিন লংম্যানের সহানুভূতি ও আদর্শের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন সেই গির্জায় অবস্থিত জমির মালিক(বৃদ্ধ) এসে সেখানে উপস্থিত হন। সেই বৃদ্ধ লংম্যানের দেশেরই মানুষ। ফলে উভয়েই একে অপরকে চিনতে পারে। বৃদ্ধ ঐই জমি সেখানকার প্রভবশালী ধনী ব্যক্তি মাখনলালকে বিক্রি করে দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবেন। কিন্তু লংম্যানের হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন যাতে মাটি না হয়ে যায়, তাই ঐই জমি বৃদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন। পঙ্গু দুখিরাম কিন্তু অত্যাচারী শাসক মাখনলালকে চিনতে পারে, যিনি ভিখারিদের ভিক্ষা করিয়ে সেই অর্থ নিজে আত্মসাৎ করতো। লংম্যান সেই কথা জানতে পেরে তিনি নিজের চলার সঙ্গী ক্রাচ দিয়ে মাখনলালকে আঘাত করতে থাকেন এবং তিনি (লংম্যান) ভর সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান। ফলে বৃদ্ধ তার মত পাল্টান এবং ঐ জমি লংম্যানকে দিয়ে দেন। মাখনলাল যাবার সময় সেই পঙ্গু দুখিরামকে পায়ে আঘাতের পর আঘাত করে তাকে মেরে ফেলেন। তাহলে কি প্রতিবন্ধীরা সারা জীবনই সমাজে শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়ে থাকবেন? সাধারন মানুষ কি তাদের এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন না? লংম্যানের স্বপ্ন কিন্তু মাটিতে মিশে যায় নি। তাকে বাস্তবে রূপ দান করেছেন সেই ডাক্তার। শেষে নিজের সংগঠনের সাহায্যে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং তার উদ্বোধনের জন্য যেমন লংম্যানকে নিয়ে যান পাশাপাশি ভিখারিদেরও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু লংম্যান যেতে আপত্তি করেন। কারণ তিনিও সংক্রমণ জনিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শেষে লংম্যান তাদের সঙ্গীদের কথা ভেবে একা না থেকে তাদের সঙ্গে ঐ হাসপাতালে চলে যান। কারণ সকলের দাবি লংম্যান তাদের কুড়িয়ে এনেছে কিন্তু আজ সব ছেড়ে তিনি একা হয়ে যাবেন। তাদের একটাই ভাবনা, আমরা এক সাথে বাঁচবো। সুতরাং প্রতিবন্ধীরা অক্ষম হলেও তারা কিন্তু নিজের বিকলাঙ্গতার

কথা না ভেবেও অন্য সাধারন মানুষদের উপকারে এগিয়ে চলেন। যা এই নাটকে লংম্যান চরিত্রটির অন্যতম একটি বিশেষ গুণ।

মনোজ মিত্রের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'(১৯৮৬) নাটকে যে প্রতিবন্ধী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, তিনি হলেন রজনীনাথ। বয়েস গোটা পঞ্চান্ন। এক মাথা কোঁকড়া কাঁচা চুল। মুখখানা হাঁড়ির মতো ফাঁপা। চোখের জল গড়াতে গড়াতে মোমবাতির গায়ের মতো দাগ জমেছে গালের ওপর। খুব কষ্ট করে কথা বলতে হয় রজনীনাথকে। মুখখানা তখন বেঁকেচুরে যায়। এক জায়গাতেই ঝিম ধরে বসে থাকেন। যেন গজভুক্ত কপিত্থ। কোলের ওপর একটা রবারের বল। বেশিরভাগ সময় রজনীনাথ তার অকেজো আঙুলগুলো দিয়ে বলটাকে টেপাটেপি করে। ওটা তার চিকিৎসার অঙ্গ। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্যারালাইসিসে ভুক্তভোগী। অলকানন্দা হলেন রজনীনাথের স্ত্রী। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তাই অলকা অনাথ আশ্রম থেকে এক ছেলে ও মেয়ে দত্তক নিয়েছেন। রজনীনাথ কিন্তু পূর্বে প্রতিবন্ধী ছিলেন না- তিনি একজন নামকরা বই ব্যবসায়ী ছিলেন, স্বাভাবিক মানুষের মতোই জীবনযাপন করতেন। কোনো অভাব অনটন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনায় অর্থাৎ বিজয়া দশমীর রাতে তারা সবাই মিলে নৌকায় চড়ে যখন গঙ্গায় বেড়াচ্ছিলেন হঠাৎ তাদের মেয়ে মানসী জলে পড়ে যায়। রজনীনাথও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল মেয়েকে বাঁচানোর জন্য। একটু পরেই মানসী জল থেকে উঠে আসে। আসলে রজনীনাথ ভুলেই গিয়েছিল যে মানসী সাঁতার জানতো। তারপর থেকেই রজনীনাথের এই অবস্থা। তিন তিনবার অপারেশনের পরও কোনো কিছু হয় নি। যার জন্য তাদের প্রেসের দোকান সব বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখন আর তাদের অর্থ-সম্পত্তি কিছুই নেই, আছে কেবল অলকার যৎসামান্য মাইনের স্কুলে গানের শিক্ষিকার চাকরিটুকু। রজনীনাথ ঘরের এককোণে একটি চেয়ারে সারাদিন পড়ে থাকে। তার হাতের চারপাশে নিজের ব্যবহার যোগ্য সমস্ত জিনিসপত্র রাখা থাকে। যেন তার একটা পুরো আলাদা সংসার। সে চলাফেরা করতে না

পারলেও চারপাশের মানুষদের কথাবার্তা বুঝতে, অনুভব করতে এবং বলতে পারে অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা রজনীনাথের আছে। শুভ,মানসী অলকার ছেলেমেয়ে না হলেও তাদের তিনি যথার্থ মানুষ করে তুলেছেন। মানসীর ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, শুভকে ভালো স্কুলে ভর্তি করেছেন। অলকার পাশে একজন ভাড়াটিয়ে ছিলেন দেবাহুতি, তার একটি কোলের বাচ্চা ছিল। দেবাহুতি তার শিশুর কোনো দায়িত্ব পালন করতেন না, শিশুটির কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বারবার তিনি ছেলের দায়িত্ব অলকাকে দিয়ে রাতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন।রজনীনাথ দেবাহুতির সেই চালাকির কথা বুঝতে পারতেন। তাই তিনি বারবার অলকাকে শিশুটির দায়িত্ব নিতে বারণ করতেন কারণ রজনী বুঝতে পেরেছিলেন কোন না কোন দিন দেবাহুতি তার শিশুটিকে অলকার হাতে তুলে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। তাই রজনী মাঝের মধ্যে রেগে অলকাকে বলতেন, শুভ-মানসী তার ছেলে নয়, তারা অলকার ছেলে। রজনীনাথ তার এই প্রতিবন্ধীতাকে তুলনা করেছেন নৌকা চরে আটকে যাওয়ার সাথে- "নড়ে না চরে না.....বৈঠা দুখানা আর বিতে পারি না।"[১] নাটকের শেষে দেখা গেল অলকা দেবাহুতির শিশুটিকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করছে- যা রজনীনাথ পূর্বে-ই বুঝতে পেরেছিল। সুতরাং রজনীনাথ শারীরিক ভাবে অক্ষম হলেও তার বোধশক্তি ছিল খুব প্রখর। যার ফলে নাটকে তিনি যথাযথ ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়ে উঠেছেন।

মনোজ মিত্রের 'গন্ধজালে'(২০০৯) নাটকে জন্মান্ধ এক নারী এবং দূর্ঘটনার কারণে দৃষ্টিহীন পুরুষ চরিত্রের কথা ফুটে উঠে। নাটকের সূত্রপাত হয়েছে গনবিবাহের মধ্যে দিয়ে। যেখানে একসঙ্গে ছাব্বিশজোড়া বিয়ে হয়েছে। তাদের মধ্যে একজোড়া বর-কনে হলেন নীলকণ্ঠ ও পঙ্খী, যারা দুইজনেই অন্ধ। হিন্দু সমস্ত রীতি মেনে বিয়ে হলেও পঙ্খী কিন্তু এই বিয়েতে খুশি

নয়। অবশ্যই তার কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, পঙ্খী ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা হারা, দিদি-জামাইবাবুর কাছেই সে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে। যদি তার মা-বাবা বেঁছে থাকতেন তাহলে বাঙালির সমস্ত রীতি মেনে তাদের নিজ ভিটেতে ধুমধাম করে বিয়ে দিতেন। যা সমস্ত মেয়েরাই চেয়ে থাকে। কিন্তু তা না করে তাকে গনবিবাহে যোগদান করে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় যে কারণ সেটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পঙ্খী নিজেই একজন জন্মান্ধ, একথা জেনেও তাকে বিয়ে দেওয়া হয় আর একজন অন্ধের সাথে, যা তার কাছে সবথেকে বড় আঘাত। একজন দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী কিভাবে অপর একজন দৃষ্টিহীনের খেয়াল রাখবে? যদি পঙ্খীর মা-বাবা বেঁচে থাকতেন তাহলে এমনটা নিশ্চয় হত না। সকল মেয়েরই স্বপ্ন তার যে বর হবে সে যেন তার সমস্ত খেয়াল রাখতে পারে। কিন্তু পঙ্খীর কপালে তা জুটলো না। আর তৃতীয় কারণটি হল- আগের দিন রাতে তাদের পিছন বারান্দায় কে যেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে তাকে টানাহ্যাঁচড়া করছিল। পঙ্খী খুব কষ্টে তার হাত থেকে রেহায় পেয়ে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। সামাজিক জীবনে সকলেই ভেবে থাকেন প্রতিবন্ধী মানেই সে সকল দিক দিয়ে অক্ষম। কিন্তু কেউ জানে না যে, প্রতিবন্ধীদের একটি অঙ্গ অক্ষম হলেও অপর অঙ্গগুলি অত্যান্ত সক্ষম ও দৃঢ় হয়ে যায়। কারণ নাটকে অন্ধ নীলকণ্ঠ অর্থাৎ পঙ্খীর বর দৃষ্টিহীন হলেও তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যান্ত সক্ষম। যার দ্বারা সে সমস্ত ধরনের গন্ধ খুব সহজেই চিনে নিতে পারে। নাটকের বিভিন্ন অংশে তার যথার্থ উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

ক) নীলকণ্ঠ শ্বশুরবাড়িতে ঘরে খাটের উপর বসে ছিল হঠাৎ সে বলে উঠল –একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি, আর সে আঁশটে গন্ধ যে পমফ্রেট মাছেরই তাও সে নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারলো। শ্বশুররাড়ির অন্য সদস্যরা তার কথা বিশ্বাস না করলেও শেষে ফেলু বুঝতে পারলো যে, পমফ্রেট মাছ সেই তো নিয়ে এসেছিল, কাল তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের খাওয়াবে বলে।

খাটের নিচে থেকে যে সত্যিই মাছের আঁশটে গন্ধ এবং বিড়াল মুখে করে মাছ এনে এখানে রেখে গেছে তা সবাই বুঝতে পারলো এবং বিশ্বাস করল।

খ) শ্বশুরবাড়ির পিছন বারান্দার বাইরে যে বাঁশ ঝাড় আছে তা নীলকণ্ঠ গন্ধের মাধ্যমেই বলে দিতে পারতো। তা আবার বাঁশ ফুলের গন্ধ শুকে, যা অবিশ্বাস্য ব্যাপার অন্য সকলের কাছে। নাটকের মধ্যে অবস্থিত একটা উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা বোঝানো হল-

নীলকণ্ঠ// "আজ্ঞে অনেক কিছুই চোখে ধরা পড়ে না, নাকে ধরা পড়ে ঠাকুরমশাই। যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, বাঁশ ফুলের গন্ধে একপাল ধেড়ে ইঁদুর আর ভুটকো একটা শিয়াল বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে গুটিগুটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন।"[২]

এমনকি নীলকণ্ঠ মানুষ ও পোশাকের গন্ধে চিনে নিতে পারে নির্দিষ্ট মানুষকে ও তার পোশাককে, যা এই নাটকের একটি আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে নীলকণ্ঠ পঙ্খীর আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারবে।

গ) নীলকণ্ঠ পঙ্খীর অভিমান ভাঙানোর জন্য তার আঙুলে একটি আংটি পড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আঙুলে পড়িয়ে দেওয়ার সময় পঙ্খীর হাতে যন্ত্রণা করে এবং সে খুলে একদিকে ফেলে দেয়। নীলকণ্ঠ আংটির বাক্সের গন্ধ শুকে আংটিটি ঠিক খুঁজে বের করে নেয়। এই দেখে পঙ্খী অবাক হয়ে যায়। সারারাত নীলকণ্ঠ ও পঙ্খী দুজনে মিলে গল্প করে এবং পঙ্খী বুঝতে পারে নীলকণ্ঠের গন্ধ শুকে চোর খোঁজার ক্ষমতা আছে। তাই পঙ্খী সেইদিন রাতে যে শয়তানটা তার সর্বনাশ করেছে, তাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য নীলকণ্ঠকে বলে এবং তার প্রমাণ হিসেবে সেই সর্বনাশকারীর পোশাকের টুকরো নীলকণ্ঠকে দেয়। কিন্তু নীলকণ্ঠ পঙ্খীকে বলে এই ক্ষমতা সে এইসব কাজে লাগায় না এবং সে পঙ্খীকে একটি উক্তির মধ্যে দিয়ে বলে- "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে- তার সমাপ্তি হয়ে গেছে। আর কেউ তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আমি তোমারে ঘিরে থাকব পঙ্খী।"[৩] নীলকণ্ঠ আড়ালে থেকে সে তার কাজ করতে

থাকে এবং অপরাধীকেও খুঁজে বার করে ফেলে। কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট না করে আত্মীয়তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় নীলকণ্ঠ তাপসকে অর্থাৎ পঙ্খীর জামাইবাবুকে একা ডেকে সেই গেঞ্জির টুকরোটি তার হাতে তুলে দেয় এবং বলে আর কোনো দিন কোনো কারণে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না দাদা। শেষে তাপস গেঞ্জির টুকরো দেখে তার অপরাধের কথা বুঝতে পারে। সুতরাং নীলকেণ্ঠর এই সকল গুন দেখে বলা-ই যেতে পারে, নীলকণ্ঠ অন্ধ হলেও সে কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের থেকে কোনো অংশে-ই কম নয়।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪০০, পৃ. ১৬১

২. মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪২০, পৃ. ২৬৬

৩. ঐ পৃ. ২৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রের বর্গীকরণ

বৈচিত্রময় উপাদান নিয়ে মানব সমাজ গঠিত। সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য আরো বেশি। সমাজে বসবাসরত মানুষদের মধ্যে পৃথক পৃথক সত্ত্বা বিদ্যমান। অভ্যন্তরীন গুণাগুণ, দোষ-ত্রুটি ছাড়া ব্যাহিকভাবেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। মানুষের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ মোটা, কেউ ফর্সা, কেউ কালো আবার অনেকেই আছে এমন যাদের মধ্যে কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও বা দৃষ্টিশক্তি নেই। আবার অনেকে কানে শোনে না, কথাও বলতে পারে না। সমাজের এসব মানুষ হলো ব্যতিক্রম। সমাজের মধ্যে এই ব্যতিক্রমধর্মী মানুষগুলো যেমন নানান বাধা-বিপত্তি-সংকটকে অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। বাংলা নাটকের মধ্যেও এই রকম বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে যাদের চরিত্রের মধ্যে মিল রয়েছে। সেই চরিত্রের ধারণার মধ্যেও মিল লক্ষ্য করা যায়। নাটকে চরিত্রের অবস্থান, নাটকে যে সংকট সেখানেও চরিত্রের ভূমিকা পালন ইত্যাদি নানান দিক গুলি যথাযথ ভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের বর্গীকরণ করে দেখানো যেতে পারে। প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কীত বাংলা নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নাটক হল- ‘মরাচাঁদ’, ‘শ্যামলী’, ‘উল্কা’, ‘দুই মহল’, ‘মৌন মুখর’ , ‘নীলকণ্ঠে বিষ’, ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’, ‘গন্ধজালে’, ইত্যাদি। এই সকল নাটকগুলিতে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে।

‘শ্যামলী’, ‘মৌন মুখর’, ‘দুই মহল’ এই নাটকগুলিতে ‘মুক ও বধির’ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই সকল ব্যক্তিদের কথা বলার অন্যতম মাধ্যম হল ইশারা। ইশারার

মাধ্যমেই এরা একে অপরের মনের ভাব বুঝতে পারে। বোবা ব্যক্তিরা সাধারনত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কালা হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা কানেও শুনতে পারে না। কথা বলা এবং কানে শোনার শক্তি হারিয়ে ফেললেও জীবন সংগ্রামে এরা কোনো ভাবেই পিছিয়ে থাকে নি। এই সকল নাটকের চরিত্রগুলি প্রথমদিকে পরিবার, পরিজন, সমাজের কাছে উপেক্ষিত হলেও নাটকের শেষে এদের জয় নিশ্চিত হয়েছে। নাটকের মধ্যেই প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির ভূমিকা, ভাবনা,ধারনা এবং নাটকে যেটা সংকট সেখানে চরিত্রের ভূমিকা পালনের মধ্যে নানান ক্ষেত্রে মিল লক্ষ্য করা যায়।

'শ্যামলী' নাটকে শ্যামলী নামক এক প্রতিবন্ধী নারীর কথা নাটকের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শ্যামলী জন্ম থেকে কালা ও বোবা। কথা বলা এবং কানে শোনার শক্তি শ্যামলীর না থাকলেও প্রকৃতির রূপ আস্বাদনের শক্তি তার যথেষ্ট রয়েছে। যার মাধ্যমে সে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যকে উপভোগ করে চলেছে- যা তাকে অন্য পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে পৃথক এক মাত্রা দান করেছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' ব্যক্তিদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা তাদের স্বাভাবিক সুস্থ মানুষদের থেকে বিশেষ মাত্রা দান করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়েও অগ্রসর হতে হয়েছে। এমনকি পরিবারের মানুষদের কাছে তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা শুনতে হয়েছে। তার মা নারায়নী শ্যামলীর এই অবস্থাকে তার নিজের পূর্বজন্মের পাপ বলেও মনে করেছে। শ্যামলী নাটকের মধ্যে তাকে নিয়ে বিবাহ-প্রহসন এবং বিবাহোত্তর পর্বে নানা জটিলতার পরিচয় আছে। ধনী ঘরের ছেলে অনিলকে রূপসী কন্যা দেখিয়ে যখন শ্যামলীকে সম্প্রদান করা হল- বিবাহ বাসরে হৈ চৈ আরম্ভ হল, কিন্তু শ্যামলীর বাবা বলেন- "যে বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ সে বিয়ে নয়- সে কনেও নয়। এটি আমার বোবাকালা বড় মেয়ে।"[১] তার বিয়ে দিতে না পারায় গাঁয়ের মুরুব্বীরা কন্যার পিতাকে একঘরেও জাতিচ্যুত

করাবার হুমকি দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, "সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটা কতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র। এর জন্য বাবা তোমরা আমায় মাপ কর; মনে কর যেন এ কিছুই নয়।"[২] সমাজের মুখ রাখতেই কন্যার পিতাকে এই হীন ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে- শ্যামলীর মতো 'কালা বোবা' মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, অবিবাহিতা কন্যা ঘরে থাকলে সমাজে মুখ দেখানো মুশকিল- তাই এই বাধ্যতা- এই নীচতা। কিন্তু তার এই কাতরতা বরপক্ষীয়দের কানে পৌছায় না, তারা ক্রমাগত বলতে থাকে – "জোচ্চোর, বদমাইশ.... সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা মেয়ে গছিয়ে দিতে এসেছে? মারো বদমাইশদের।"[৩] নানান কীর্তিকলাপের মধ্যে দিয়ে শ্যামলীর বিয়ে হলেও বিয়ের পরে সে সুখী হতে পারেনি। তার শাশুড়ি তাকে পাগল বলেও মনে করত। সামাজিক জীবনে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এরকম নানান ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুভা গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন - 'যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না'- প্রতিবন্ধীদের সংকট এখানেই। তার একটি অঙ্গের বৈকল্য মানে যে সে পুরো বাতিল সমাজ থেকে –তা নয়। তবু আজও প্রতিবন্ধী মানুষ সমাজের মূলস্রোত থেকে নির্বাসিত। অধিকার ও সুযোগ-বঞ্চিত এই মানুষেরা প্রাচীনকাল থেকেই পায়ের নিচে শক্ত মাটি পাবার সংগ্রামে লিপ্ত। প্রথমদিকে শ্যামলীর সাংসারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা না থাকলেও দিন যত এগিয়ে চলেছে, শ্যামলীর জ্ঞান ততই বেড়ে চলেছে। কথা বলতে না পারলেও স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য তাকে সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বামীকে দেখে মাথায় ঘোমটা দেওয়া, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, এমনকি শাশুড়ি যে তার গুরুজন- যার নির্দেশিত পথে এবং চরণে আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে সংসার পরিপূর্ণতা লাভ করবে। শ্যামলী নামক চরিত্রটি নাটকের শেষে ইশারার মধ্যে দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলত শাশুড়ি নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং শ্যামলীকে ছেলের বউ রূপে

স্বীকার করে নিজের বুকে টেনে নেন। যা শ্যামলীকে নাটকের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ও বৈচিত্রে ভূষিত করে।

'শ্যামলী' নাটকের মতো 'মৌন মুখর' নাটকেও অন্যতম প্রধান চরিত্র হল মিনতি, যে জন্ম থেকেই বাক্ প্রতিবন্ধী। মিনতি বোবা হলেও কানে কালা নয় অর্থাৎ সকলের কথা বোঝা এবং অনুভব করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট রয়েছে। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অতীন তাকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকে অতীন নিজেকে একাকীত্ব বোধ করতে থাকে। কারণ বাড়িতে তার সাথে কথা বলার মতো কোনো সঙ্গী ছিল না। এমনকি অতীন মিনতিকে যাদুঘরের মুর্তির সঙ্গে তুলনা করেছে- যে কোনো কথা বলে না, সব সময় কেবল চুপ হয়ে থাকে। তাই স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য অতীন চিকিৎসকের সাহায্য নেন। চিকিৎসার ফলে মিনতি বাক্শক্তি ফিরে পান। জন্মদিন নাটকেও হেলেন কেলারের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির অন্যতম সোপান ছিল চিকিৎসক এ্যাগানোস। মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'জন্মদিন' নাটকে বলেছেন- "অক্ষর জুড়ে হয় শব্দ। শব্দের পাশে শব্দ বসালে আসে বাক্য। যদিও তার সার্থকতা পরিচিত অর্থময়তায়। মানুষ তাই তার ভাষা খোঁজে উচ্চারিত ধ্বনির বিন্যাসে। কিন্তু যে মানুষ শেখেনি ভাষা, জানে না তার সার্থক ব্যবহার, সমাজ তাকে বলে অবাঞ্ছিত। তবুও মানুষ যদি মানুষের পাশে দাঁড়ায়, এক দিন সে খুঁজে পায় তার প্রকাশের ভাষা। প্রথাগত ঠোঁটে নয় – আঁখি আর আঙুলের ছন্দোময় সতত সঞ্চারে।"[৪] চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি এবং যথার্থ নিপুণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, এর জন্য প্রয়োজন নিজ মনের জোর ও তাগিদ। মৌন মুখর-এ মিনতি বাক্শক্তি ফিরে পাওয়ার পর তার এতদিনের অতৃপ্ত কথা বলার বাসনা পরিপূর্ণতা পায়। এমনকি মিনতি তার বক্তিতার মধ্যে প্রাচীন ও বর্তমান কালকে এক সুতোই মিলিয়েছেন। কারণ বাধাপ্রদ

জীবনে মিনতির মধ্যে যে অপূর্ণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, চিকিৎসার ফলে তিনি যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন তখন তিনি নিজের কৌতুহল ও আবেগকে সামলাতে পারেন নি। তাই সুস্থ হবার পর তিনি অনবরত কথা বলেই চলেছেন- যা নাটকের মধ্যে যথাযথ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'শ্যামলী' নাটকে শ্যামলী বাকশক্তি ফিরে না পেলেও সে নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সদা সচেতন ছিলেন- স্বামী প্রতি তার কর্তব্যবোধ এবং শাশুড়ির সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়েই যে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তা শ্যামলী ইশারার মাধ্যমে নাটকের অন্তিমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'মৌনমুখর' নাটকে মিনতি বাকশক্তি ফিরে পেলেও তার অস্বাভাবিক ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত অতীন (মিনতির স্বামী) পাগলে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি নাটকের মধ্যে যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়েছে তা বাস্তব অতিরিক্ত বিষয় বলেই মনে করা যেতে পারে। সুতরাং নাটকটি বাস্তবের মধ্যে দিয়ে বাস্তবোত্তর হয়ে উঠলেও নাট্যকার মূলত প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকেই দর্শক এবং সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকেও বাক্ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের কথা উঠে এসেছে। যাদের দিয়ে একশ্রেণীর মানুষ ক্রমাগত ব্যবসা করে চলেছে। এই ব্যবসার মূলে রয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে-ই নিজেরদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কারণ এরা জানতেন ভিক্ষা না করলে এবং মালিকের পায়ের নিচে না থেকে তাদের কথা পালন না করলে তারা এই সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। এমনকি দুমুঠো ভাতও মুখে তুলতে পারবে না। নীলকণ্ঠে বিষ নাটকেও মাখনলাল এই ভাবে দুখিরাম নামক এক প্রতিবন্ধীকে অত্যাচার করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। তাই এই প্রতিবন্ধী বাক্তিরা মালিক সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে অত্যাচারিত হয়েও নিজেকে সমাজের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছেন। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা একে অপরের সাহায্যের মধ্যে দিয়ে যে কোন কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। কারণ কারো কাজে যেন অসুবিধা না ঘটে সমাবস্থা

বজায় থাকে এবং মালিকবর্গের অত্যাচার ও নির্যাতন যাতে না ঘটে। এই সমস্ত অসাধু মালিকবর্গের কুকর্মের ফলে সমাজের 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' ব্যক্তিদের নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এমনকি স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিদের এরা নানান ছল চাতুরীর মধ্যে দিয়ে অপহরণ করে এনে প্রতিবন্ধীতে পরিণত করছে। রঞ্জনের মতো এই সকল অত্যাচারী ব্যক্তিদের শোষণ, অত্যাচার এক ভাবে চলতে পারে না। কোন না কোন ভাবে এর সমাপ্তি ঘটে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জয় নিশ্চিত হয়। নাটকের উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখানো যেতে পারে-"মাইকে ভেসে আসে ওসমানীর গলা- হামার বাচ্চাকে যদি খতম কর তাহলে তোমার বাচ্চার সর্বনাশ হবে। আবার সুবীরের গলা- তোমার এই মহৎ জীবনের সৌভাগ্যকে সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই বাইরে থেকে তোর ঋন পরিশোধ করতে চল্লাম। রঞ্জন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ে।"[৪] ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে তাই এই সকল অত্যাচারী ব্যক্তিদের নির্মূল করার ক্ষেত্রে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাক্ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত এই সকল চরিত্রগুলির প্রত্যেকের কথা বলার শক্তি না থাকলেও এরা কিন্তু কোনো ভাবেই নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দেননি। সমাজ এবং পরিবারেও যে তাদের গুরুত্ব যথাযথ ভাবে রয়েছে- তা প্রত্যেকটি নাটকেই নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে কোনো মানুষের জীবনে নানান বাধা বিপত্তি থাকবেই, তাকে জয় করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যাওয়ার যে আকুতি তা এই চরিত্রগুলি নিজ নিজ ভূমিকার মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পাশাপাশি দৃষ্টিহীনদের নিয়ে বাংলায় যে সকল নাটকগুলি হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'মরাচাঁদ', 'দুই মহল' এবং 'গন্ধজালে' । এই নাটকগুলিতে যে অন্ধ চরিত্রগুলি রয়েছে তারা কিভাবে নিজেদের একটি অঙ্গের অপূর্ণতাকে উপেক্ষা করেও অন্য অঙ্গগুলিকে সক্রিয় রেখে কিভাবে নিজেদের অধিকার, মর্যাদা ও অস্তিত্বকে পূর্ণমাত্রায় টিকিয়ে রেখেছেন তা দেখবার বিষয়।

মনোজ মিত্রের ‘গন্ধজালে’ নাটকে দৃষ্টিহীন যে দুজন প্রতিবন্ধী চরিত্রের কথা পাওয়া যায় তারা হলেন নীলকণ্ঠ ও পঙ্খী। এরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে ওঠেন। পঙ্খী এই বিয়েতে প্রথম দিকে সুখী হননি। কারণ তিনি নিজে দৃষ্টিহীন হওয়ায় একজন দৃষ্টিহীন স্বামীর প্রত্যাশা কখনোই করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী হবেন একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ, যে তার বিপদে আপদে পাশে থাকতে পারবেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে পঙ্খীর সাথে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় কে যেন বারান্দায় তাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে। পঙ্খী খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে এই বিপদ থেকে মুক্তি পান এবং ঐ মুহূর্তে তিনি ধর্ষণকারী ব্যক্তির জামার একটুকরো কাপড় ছিড়ে নিয়ে ছিলেন। নীলকণ্ঠ অন্ধ হলেও অন্য পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তির তুলনায় তার একটি বিশেষ ক্ষমতা বিদ্যমান অর্থাৎ তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং অনুভবের ক্ষমতা অত্যান্ত প্রখর। নাটকের উল্লেখিত একটি উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে তা বোঝা যায়- নীলকণ্ঠ// “আজ্ঞে অনেক কিছুই চোখে ধরা পড়ে না, নাকে ধরা পড়ে ঠাকুরমশাই। যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, বাঁশ ফুলের গন্ধে একপাল ধেড়ে ইঁদুর আর ভুটকো একটা শিয়াল বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে গুটিগুটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন।”[৫] যা তাকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মাত্রা দান করেছে। যাকে কাজে লাগিয়ে নীলকণ্ঠ পঙ্খীর ধর্ষনকারীকে চিনে ফেলে। কিন্তু সে ধর্ষনকারী ছিলেন তাদেরই ঘরের লোক, পঙ্খীর জামাইবাবু। শেষে নীলকণ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পঙ্খীর জামাইবাবুকে অর্থাৎ তাপসকে আড়ালে ডাকেন এবং ঐ কাপড়ের টুকরোটি তার হাতে তুলে দেয় আর বলে- আর কোনো দিন কোনো কারণে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না দাদা। শেষে তাপস নিজের এই ব্যবহারে অত্যান্ত লজ্জিত হন। সুতরাং প্রতিবন্ধী মানেই যে প্রতি ক্ষেত্রে বন্ধি তা নয়, যার প্রমাণ নীলকণ্ঠ নাটকের মধ্যে দেখালেন।

'মরাচাঁদ' নাটকেও নীলকণ্ঠের মতো একজন সৎ, সাহসী এবং সুপুরুষের কথা পাওয়া যায়, যার নাম পবন। পবন এক অন্ধ শিল্পী ছিলেন, যিনি নিজেই গান বুনে নিজেই গাইতেন। এরপর পবন এক সুন্দরী বউ বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। কারণ তার ইচ্ছে ছিল- সুন্দরী বউকে দেখে গ্রামের সবলোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের সেই চোখ দিয়ে অন্ধ পবন দেখতে পাবে তার স্বপ্নগুলো। কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। কারণ পবনের স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত থাকেন। পবন অন্ধ হলেও এই বিষয়টি তিনি স্ত্রীর কথা বলার ভঙ্গি এবং অনুভবের দ্বারা বুঝতে পারেন। ফলত পবন স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। আবার নতুন করে বেঁচে ওঠার আশা, গান বোনার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। পাশাপাশি দুই মহল নাটকে একাধিক অন্ধ ব্যক্তির কথা উঠে এসেছে। আমরা যে যুগে বাস করছি তা হল নিপীড়িত মানবতার যুগ। মুখোস পরা মহাত্মারা গোপনে গোপনে সমাজের নীচু তলায় বিকৃত বিকলাঙ্গ মানুষদের নিয়ে যে ব্যবসা চালাচ্ছেন, এই নাটকে তা উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। নাটকের মধ্যে একাধিক অন্ধ ব্যক্তিদের কথা উঠে এসেছে। যারা মালিকদের দ্বারা অত্যাচারিত হলেও কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি। বিষয়বস্তু রূঢ় হলেও নাট্যরসে তা সঞ্জীবিত। সুতরাং দৃষ্টিহীন হলেও যে সে ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ থেকে বঞ্চিত তা নয়। অন্ধ ব্যক্তিদের দৃষ্টি না থাকলেও যে তারা অদ্ভুদ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে তা উক্ত নাটকগুলির মধ্যে দিয়েই যথাযথ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আবার অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যে সকল নাটকগুলির চরিত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছেন সেগুলি হল-দুই মহল, নীলকণ্ঠে বিষ, অলকানন্দার পুত্রকন্যা। এই নাটকগুলিতে লক্ষ্য করা যায় এই সকল প্রতিবন্ধীরা অক্ষম হলেও তারা কখনো পরাজয় বরণ করেননি বরং দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন এবং অচল হয়েও অন্য ব্যক্তিদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি নাটক আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা লক্ষ্য করা যাবে।

মনোজ মিত্রের ‘নীলকণ্ঠে বিষ’ নাটকে দুজন অস্তিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর কথা উঠে এসেছে। একজন লংম্যান, যে খোঁড়া-ক্রচে ভর দিয়ে চলেন। তিনি ছিলেন মিশনারি চার্চের ফাদার। মিশনারি সমাজের লোকেরা তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজের বাইরে এক ঘন অরন্যে একটি গুহায় প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য রেখে দিয়ে আসেন। লংম্যান একা সেই গুহায় বসবাস করেননি। পাশাপাশি তিনি সমাজের সেবা মূলক কাজেও নিযুক্ত হন অর্থাৎ সমাজের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ভিক্ষুক মানুষ, যারা এক শ্রেনীর মালিকবর্গের দ্বারা অত্যাচারীত হতেন। তাদের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তার কাছে আশ্রয় দেন। যাদের মধ্যে ছিলেন একজন অচল ব্যক্তি। এমনকি লংম্যান নিজে বিপদের মধ্যে থেকেও ঐই সমস্ত মানুষদের নানান কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। নিজে অভুক্ত থেকেও ঝড়ঝাপটার মধ্যে তাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আবার এই সমস্ত রোগপীড়িত মানুষদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরির স্বপ্নও দেখেছেন। নিজের এই স্বপ্নকে কেবল স্বপ্নের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি বরং তাকে বাস্তবেও রূপ দিয়েছিলেন।

‘নীলকণ্ঠে বিষ’ নাটকের মতোই ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’ নাটকেও আর একজন অচল, অক্ষম চরিত্রের কথা উঠে আসে, তিনি হলেন রজনীনাথ। খুব কষ্ট করে কথা বলতে হয় রজনীনাথকে। মুখখানা তখন বেঁকেচুরে যায়। এক জায়গাতেই ঝিম ধরে বসে থাকেন। যেন গজভুক্ত কপিত্থ। কোলের ওপর একটা রবারের বল। বেশিরভাগ সময় রজনীনাথ তার অকেজো আঙুলগুলো দিয়ে বলটাকে টেপাটেপি করে। ওটা তার চিকিৎসার অঙ্গ। রজনীনাথের স্ত্রীর নাম অলকানন্দা। তাদের নিজেদের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। তাই অলকা অনাথ আশ্রম থেকে এক ছেলে ও মেয়ে দত্তক নিয়েছেন। রজনীনাথের প্রতিবন্ধকতার কারণ তার মেয়ে। কারণ একবার তারা স্বপরিবারে নৌকায় করে গঙ্গায় যাত্রা করেছিল, হঠাৎ তার মেয়ে নৌকা থেকে জলে পড়ে যায়। তখন রজনীনাথ সাঁতার না জেনেও নিজের জীবনের মায়া না করে

মেয়েকে বাঁচানোর জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। তিনি ভুলে গেয়েছিলেন যে মেয়ে সাঁতার জানে। কিছুক্ষণ পর মেয়ে সুস্থ অবস্থায় জল থেকে উঠে আসলেও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন নি। যার ফলে তিনি প্রতিবন্ধকতায় পরিনত হন। অলকা শিশুদের খুব ভালোবাসতেন, যা রজনীনাথ জানতেন। কিন্তু তাদের এই দত্তক নেওয়া ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে ওঠে , তারা নিজেদের পরিচয় জানতে পেরে রজনী ও তার স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যান। যার মূল কারণই হল বর্তমানে রজনীনাথের আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়। এরপর অলকা পাশের বাড়ির এক শিশু সন্তানকে নিজের ছেলের মতো যত্ন করতেন। কারণ ঐ সন্তানের মা সবসময় শিশুটিকে অলকার কাছেই রেখে যেতেন এবং সেই মহিলাটি তার সন্তানের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। রজনীনাথ একজন অচল ব্যক্তি হয়েও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আসতে আসতে অলকার ঐই শিশুর প্রতি মৌহ জন্মাচ্ছে। তাই রজনীনাথ অলকাকে ঐই সন্তানের কাছ থেকে দূরেই থাকতে বলেছিলেন কিন্তু অলকা তার এই পরিনাম প্রথমে বুঝতে পারেননি, যা রজনীনাথ অলকার আচরণের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং রজনীনাথ অক্ষম এবং চলাফেরা করতে না পারলেও যে কোনো মানুষের কথাবার্তা এবং চালচলনের ভঙ্গি দেখে প্রথমেই বুঝতে পারতেন ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ঠ্য। রজনীনাথ ও অলকার ছেলে-মেয়েরা তাদের ছেড়ে চলে গেলেও তারা কখনোই রজনীনাথের প্রতিবন্ধকতার জন্য কারোর উপর দোষ দেননি। যার মধ্যে দিয়ে রজনীনাথ হয়ে উঠেছেন একজন দায়িত্বশীল পিতা এবং বড়ো মনের মানুষ। যা একজন সৎ ও মহৎ মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ঠ।

পাশাপাশি ‘দুই মহল’ নাটকেও একাধিক অক্ষম ব্যক্তি রয়েছে যারা ঠিকঠাক চলাফেরাও করতে পারেন না। তবুও তারা মালিকের অত্যাচারে এবং দুমুঠো ভাতের আশায় সারাদিন ভিক্ষা করেই যান। এই সকল প্রতিবন্ধীরা সকল সময় চেষ্টা করতেন একে অপরের সাহায্য করতে। কারণ তারা ভিক্ষা করে বেশি উপার্জন না করলে মালিক সম্প্রদায় তাদের উপর নানান ভাবে

অত্যাচার করত, যা এই সকল ব্যক্তিরা কখনোই চাইতেন না। আবার এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুজন মনুয়া ও ওসমানী যখন একে অপরকে ভালোবাসতে থাকে। সকলের অজান্তেই একটি সন্তানের জন্ম দেন এবং নিজেরা শত কষ্টে থেকেও সন্তানকে রক্ষা করেছিলেন। তারা জানতেন ব্যবসা ক্ষেত্রে মালিক সম্প্রদায় এই শিশু কথা শোনা মাত্রই তাকে শেষ করে দেবেন। তাই তারা সকলের অজান্তেই শিশুটিকে মানুষ করতে থাকেন। সুতরাং প্রতিবন্ধীরা অচল ও অক্ষম হলেও তারা কখনো এই জীবনযুদ্ধে হেরে যাননি। সমাজ তাদের অসহায় ও নিরুপায় ভাবলেও তারা কখনো নিজের পরাজয় মাথা পেতে মেনে নেন নি। তারাও সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

'উল্কা' নাটকে যে প্রতিবন্ধী চরিত্র অরুনাংশের কথা উঠে আসে সে অন্য নাটকগুলির চরিত্রের মতো দৃষ্টিগত, শ্রবণগত বা বাক্ প্রতিবন্ধী না হলেও জন্মমুহূর্তে পরিপূর্ণ রূপ ও আকৃতি লাভ করেনি অর্থাৎ রূপ বা আকৃতিগত দিক থেকে সে প্রতিবন্ধকতার স্বীকার। সে এতটায় দেখতে কুৎসিত যে তার পিতা তাকে জন্মের পর-ই পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাকে ছেলের পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করেছেন। যার ফলে তাকে অনাথ আশ্রমেই মানুষ হতে হয়েছে। অন্যান্য নাটকের প্রতিবন্ধী চরিত্রের মতো এখানেও অরুনাংশুর মধ্যে এক বিশেষ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়- সে ছিল একজন দক্ষ বেহালা বাদক। পাশাপাশি অরুনাংশু যখন নিজের আসল পরিচয় জানতে পারে তখন সে পরিবারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনেও পিছুপা হননি। অরুনাংশু নিজের মাকে দেখার পর সে একজন পুত্রের দায়িত্ব মায়ের অজান্তেই পালন করেছে। কারণ একজন পুত্রের কাছে তাঁর মা দেবীর সমান। অরুনাংশু প্রতিদিন রাতে সকলের অজান্তেই তাঁর মায়ের চরণের কাছে ফুল রেখে আসতেন, যা একজন মাতৃপ্রেমি ও সৎ সন্তানের পরিচয় বহন করে। অরুনাংশু যখন রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসে উনাকে পিতা বলে ডাকেন, তখনও উনি অরুনাংশুকে পুত্রের পরিচয় দেননি। ফলে চোর সন্দেহে অরুনাংশু

জেল হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও অরুনাংশু বড়ো দাদার কর্তব্য পালন করে এবং ছোট ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে অরুনাংশু যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিল তখনও তাঁর কুৎসিত মুখ মাকে দেখাতে চাননি। পাশাপাশি রাজীরনাথও শেষে অরুনাংশুকে পিতৃ পরিচয় দেন এবং নিজের ভুলও বুঝতে পারেন। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে অরুনাংশু তাঁর মায়ের কাছে একটি মাত্র চাওয়া- মা তাকে যেন এই অন্তিম মুহূর্তে একটু কোলে করে আদর করেন। অতএব অরুনাংশু একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক মানুষের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজের ব্যবহার ও কাজের মধ্যে দিয়ে একজন যথাযথ ও আদর্শ পুত্র, ভাই, মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। ফলত যেকোনো মানুষকে তাঁর রূপ ও চেহারা দেখে মনুষ্যত্বের বিচার করা উচিত নয়, তাঁর নিজ কর্মের মধ্যে দিয়েই নিজের পরিচয় বহন করে। প্রত্যেকটি নাটকে এক বা একাধিক প্রতিবন্ধী রয়েছে, যাদের কোন না কোন অঙ্গ অচল ও অক্ষম। কিন্তু তারা তাদের এই একটি অঙ্গকে বৈকল্যের কারণ মনে না করে অন্য অঙ্গগুলিকে অতি মাত্রায় সচল রেখে এবং ব্যবহার করে এগিয়ে চলেছেন। যার মধ্যে দিয়ে তারা সমাজ ও দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. শ্যামলী, পেপার ব্যাক সংস্করন, মিত্র ও ঘোষ, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ. ১৫৩

২. ঐ পৃ. ১৮৭

৩. ঐ পৃ. ১৮৯

৪. রমন মহেশ্বরী, গ্রুপ থিয়েটার ২২ বর্ষ, সি এফ ২০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ২০১

৫. জোছন দস্তিদার, দুই মহল, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ১৩৬৫ পৃ. ১০৪

৬. মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪২০, পৃ. ২৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রের অভিনয়

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। নাটক শব্দটির মধ্যে নাটক কী, তার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটক,নাট্য,নট,নটী- এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হল নট্। নট্ মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। নাটকের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Drama । Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোন কিছু করা। নাটকের মধ্যেও আমরা মূলত অভনেতা-অভিনেত্রীদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। সাহিত্যের প্রাচীন রুপটিকে কাব্য বলা হত। কাব্য ছিল দুই প্রকার- শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তখন সাহিত্য প্রধানত পাঠ করে শোনা হত। আর যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হত সেগুলো ছিল দৃশ্যকাব্য। এ জন্য সংস্কৃতে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটক শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না, এতে শোনারও বিষয় থাকে। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা এবং সংলাপ শোনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। সংস্কৃতিতে একে বলা হয়েছে কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- ‘কাব্যেষু নাটকং রম্যম্’। নাটক পাঠ করা যেতে পারে মঞ্চে,টিভি-রেডিও বা অন্য গনমাধ্যমে অভিনীত হতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। তাই এর বিশেষ কিছু গঠনবৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও নাটক সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। সেগুলি হলো- কাহিনী,চরিত্র,সংলাপ,পরিবেশ। নাটকের পাত্রপাত্রী বা চরিত্রগুলোর সংলাপ অথবা পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। কাহিনীটি হয়তো

মানবজীবনের কোন খন্ডাংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক দবন্দব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে নাটকের কাহিনী প্রকাশিত হয়। আবার চরিত্রগুলোর মুখর হয় সংলাপের ভেতর দিয়ে। বলা যায়,সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের কাহিনী ও চরিত্রগুলোকে ব্যক্ত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সংলাপের মাধ্যমেই তৈরি হয় নাট্যপরিস্থিতি। উপন্যাস বা গল্পের লেখকের বর্ণনার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি ও ব্যাখা করতে পারেন। নাটকে সে সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন সংলাপ এবং অভিনয়। তাই নাটকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে সংলাপ ও অভিনয়ের ওপর। নাটকের কাহিনী, চরিত্র বা সংলাপ সংযোজনের জন্য নাট্যকারকে তৈরি করতে হয় উপযুক্ত পরিবেশের। অর্থাৎ কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এ ঘটনাটি ঘটছে বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরিত্র এ আচরণ করছে বা সংলাপ বলছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। মঞ্চনাটকে মঞ্চসজ্জ, অলোকসম্পাত, শব্দযোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য নির্দেশক। অভিনয় থেকে শুরু করে সমগ্র প্রক্রিয়াকে এক সুতোয় গাঁথেন নাটকের নির্দেশক। নাট্যকার তাঁর নাটকেই এর নির্দেশনা রাখেন। বাংলা নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রে যে সকল অভিনেতারা অভিনয় করেছেন তাদের প্রতিবন্ধতার ধরণ, বৈশিষ্ট, অভিনয় বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ধরনের। যার মধ্যে দিয়ে তারা দর্শকের কাছে বিশেষ মর্যাদার আসনে ভূষিত হয়েছে।

‘মরাচাঁদ’ বিজন ভট্টাচার্য দুবার লিখেছেন। প্রথমে একটি একাঙ্ক ১৯৪৬ সালে, যেটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে। পরে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন একই কাহিনী নিয়ে ১৯৬১ সালে। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দোতারা বাজিয়ে টগর অধিকারীর জীবন ইতিহাস নিয়ে মরাচাঁদ লেখা। মরাচাঁদের মূল চরিত্র অন্ধ গায়ক পবন। নাটকের মধ্যে পবনের

জন্মান্ধতার অভিনয় লক্ষ্য করা যায়। নাটকের মধ্যে পবন চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। এই নাট্য বস্তুটি ক্রমরূপান্তরে একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিগত একটি যন্ত্রণাকে তিনি ক্রমে ক্রমে এক জাত শিল্পীর বাস্তব জীবন ও শৈল্পিক অঙ্গীকারের দ্বন্ধ ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনের সেই পরিমণ্ডলে নিয়ে গেছেন যেখানে শিল্পী নিজ জীবনের সংকটের উত্তরণ ঘটান ওই দ্বন্ধ থেকে উৎসারিত কোন সৃষ্টিতে। সমস্ত নাটকের মধ্যেই তিনি অন্ধের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। পাশাপাশি পরে লুব্ধক নাট্যগোষ্ঠী মরাচাঁদ নাটকটির একটি একাঙ্ক রূপ অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। লুব্ধক নাট্যগোষ্ঠীর অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো মঞ্চচিত্র বিভাগটি ভাবা হয়। রূপায়নের ভাবনাচিন্তার মূলে ছিল দুজন ব্যক্তি। লুব্ধকের শিল্প নির্দেশক হিমাদ্রি নায়ক ও কারিগরী বিভাগের প্রধান শুভেন্দু রানা। নাটকে পবন দোতারা বাজিয়ে গান গায়। রাজনৈতিক সভায়ও গান গাইতে নিয়ে যায় বাবুরা কখনও-সখনও। তার সুন্দরী বউ প্রেমে পড়ল এক বৈষ্ণব ভেকধারী ভণ্ডের। তারপর একদিন তার সঙ্গে চলে গেল। বউ হারিয়ে ভেঙে পড়া পবন রাজনৈতিক কর্মী শচীনবাবুকে বলে, ‘আমি কিন্তু বাঁচতি চেইছিলাম’। শচীন রাজনৈতিক সভায় গান গাইতে বললে পবন আর্তনাদ করে ওঠে, ‘গান আর হবে না, শচীনবাবু। গান আর আমি গায়তে পারব না’। শেষে রাজি হয় তার ঘর বাঁধার গান গান গাইতে। মরাচাঁদ-এর পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যটি বিজন ভট্টাচার্য লেখেন ১৯৬১ সালে। ঐ বছরেই ‘চলচ্চিত্র’ পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। পরে লেখক এতে কিছু সংযোজন করেছিলেন। নাটকটি একজন প্রকৃত শিল্পীর আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকার কথা বলে। স্ত্রী রাধা কেতকদাসের সঙ্গে কণ্ঠী বদল করে চলে যাওয়ায় পবন তার গান হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু শচীনবাবুর অনুরোধে শেষে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা ‘ বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা’ গানটি গেয়ে ওঠা। একজন আলোচক লিখেছেন, মরাচাঁদ শুধু অন্ধ শিল্পী টগর অধিকারীর জীবনচিত্র নয়, নিঃসঙ্গ সংগ্রামী শিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের দূরবর্তী প্রতিভাসও। রচনা সংগ্রহের ভূমিকায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ইঙ্গিত করেছেন।

তাঁর ভাষায়, "টগর অধিকারীর অন্ধত্ব ও সুন্দরী বউয়ের স্বপ্নসাধ ছাড়া 'মরাচাঁদ' নাটকে টগর- কাহিনীর আর কিছুই নেই। বরং এমন কথা কি ভাবা যায় যে এই সময়ের মধ্যে বিজনবাবুর ব্যক্তিজীবনে যে সংকট এনেছেন- মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ ভাঙছে, মহাশ্বেতার জীবনে অন্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটছে, এবং ভাঙার অন্যতম কারণ সাংসারিক অভাব, সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনতে বিজনবাবু অপারগতা ও রাজনীতি ও বিচিত্র বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রক্ষার দায়ব্রত (বাড়িতে যখন তখন পুরাতন বেদে, সাপুড়ে বন্ধুদের আগমন ও সাম্যিক অবস্থানের কাহিনী শুনেছি)- তা থেকেই মরাচাঁদের সূত্রপাত? আর বিজন-পবনের ঐক্যকে আড়াল করতেই টগর অনুসঙ্গের ব্যবহার?"[১] পাশাপাশি কেতকদাসের ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। বুধবার ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৮ মুক্তাঙ্গনে কবচকুন্ডলের প্রযোজনায় 'মরাচাঁদ' করেন বিজন ভট্টাচার্য। মুখ্য চরিত্র টগর অধিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ভাঙা প্ল্যাটফর্ম, পায়ে আঘাত লেগেছিল। রাত তিনটে নাগাদ বমি। পরের দিন শবযাত্রা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, তথ্যকেন্দ্র, মাইম একাডেমি, মুক্তাঙ্গন হয়ে কেওড়াতলা- সবাই মিলে তখন গাইছিল 'আন্তর্জাতিক'। মুহূর্তের মধ্যে 'ভাঙাচোরা চওড়া বুকের খাঁচা-টা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।' মৃত্যুর আগে শেষ জীবনে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট একাডেমি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগীত নাটক একাডেমি থেকে।

স্টার থিয়েটারের একটি অন্যতম নাটক শ্যামলী। স্টারে 'শ্যামলী' নাটকটিতে অভিনয় করার পরে উত্তমকুমারের নাম হয়ে গিয়েছিল শ্যামল। না, নামটি সাধারণ অনুরাগীবৃন্দ দেননি। দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। এ নাটক দেখে বিধানচন্দ্র এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে নাটক শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে উত্তমকে জানিয়ে আসেন যে এরপর থেকে তিনি উত্তমকে 'শ্যামল' বলেই ডাকবেন। নাটকে অবশ্য উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্রটির নাম ছিল

অনিল। এই কাহিনীতে এ চরিত্রটি আধুনিক- মনস্ক, সংস্কারমুক্ত এক যুবা, যে এক অসহায় বোবা মেয়েকে বিয়ে করছে, সেই মেয়েই শ্যামলী। চরিত্রটি করতেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। শত প্ররোচনাতেও অনিল অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী শ্যামলীকে ছাড়তে রাজি নয়। আবার এই নাটকে অনিলের মা সরলার চরিত্র করতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরয়ূবালা দেবী। যাকে উত্তম 'সরয়ূ মা' বলে ডাকতেন। শোনা যায়, এ নাটক দেখার পর বহু মহিলা দর্শকই বলতেন, আমার যদি উত্তমের মতো একটা ছেলে থাকত। শ্যামলী প্রথমবার মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৩- র দুর্গাপুজোর ভেতর। ১৫ অক্টোবর তখন পুজোতে নতুন নাটক নামত 'বোর্ড' মানে বাণিজ্যিক থিয়েটারে। তখনও পর্যন্ত উত্তমের হিট বলতে দুটোই ছবি- 'বসু পরিবার' আর সাড়ে ৭৪' । দায়িত্ববান স্বামী আবার একই সঙ্গে নিষ্ঠাবান পুত্র- এমন একটি রসায়নে ভেজা চরিত্র অনিল, সন্দহ নেই উত্তমের 'পারিবারিক হিরো'র কেরিয়ারে বাড়তি আঁচ জুগিয়েছিল। এ নাটকে ৪৮৪ রজনী নায়ক সাজতেন উত্তম। টানা তিন বছর জুড়ে। যখন শো করা বন্ধ করেন, তখন তিনি বাংলা ছবির 'সুপারস্টার'। কেন আসেন? কেন যান? পাঁচশো রজনী পূর্ণ হতে তখন আর মাত্র ১৬টি শো বাকি। সপ্তাহে চারটি করে শো হত এ নাটকের। মানে আর এক মাস শো হলেই 'মাইলস্টোন'টি ছুঁড়ে ফেলত 'শ্যামলী'। তখনও এ সৌভাগ্য কোনও নাটকের হয়নি। অথচ এমন সময়ে কেন এ নাটক ছাড়লেন উত্তম? সে সময় একটি 'গুজব' বাজারে উড়ছিল। উত্তমের সঙ্গে নায়িকা সাবিত্রীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। রটেছিল পারিবারিক অশান্তির জেরে নাকি মঞ্চ ছাড়লেন উত্তম। কিন্তু যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা হল মঞ্চেই উত্তমের অসুস্থ হয়ে পড়া। শো কোনওরকমে শেষ করেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বন্ধু ডাক্তার লালমোহন মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা করে বোঝেন উত্তমের 'প্যারাটাইফয়েড' হয়েছে। এতে শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে উত্তমের যে মঞ্চের ধকল নেওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে 'শ্যামলী'র অনিল বদলায়। উত্তমের জায়গায় আসেন নবকুমার।

নবকুমার ছিলেন মঞ্চের নামী অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর ছেলে। বেশ কিছু সিনেমাও করেছেন। কিন্তু ওই চরিত্রে উত্তম ছাড়া আর কাউকেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না দর্শক। ফলে, টিকিট বিক্রি কমল। উত্তম সে খবর পেয়ে 'স্টার থিয়েটার' এর প্রতি মমত্ববশতঃ ফিরে আসেন বটে আবার এ নাটকে, তবে তা সামান্য কিছুদিনের জন্য। আর তখন উত্তমকে ঘিরে যে পাগলামি শুরু হয়েছে অনুরাগীদের, তাঁর চাপ আছড়ে পড়ত হলে উত্তমের ঢোকা-বেরনোর সময়ে। সবাই উত্তমকে একটু ছুঁতে চান। ফলে পুলিশ পিকেট করে ঢোকা-বেরনো করতে হত। 'শ্যামলী' আর বেশিদিন চলেনি। পরে 'শ্যামলী' সিনেমায় বানান অজয় কর। স্টার থিয়েটারে উত্তমের যোগদান নিয়ে দুটো ঘটনার কথা জানা যায়। এক, অ্যামেচার থিয়েটারের ব্যাপারে কয়েকটি বিরক্তির কথা উত্তম একবার জহর গাঙ্গুলিকে বলেন, তখন তাঁরা বিখ্যাত নাটক থেকে তৈরি চিত্রনাট্য 'মানময়ী গার্লস স্কুল'- এর শুটিং করছেন। জহরবাবু উত্তমকে পরামর্শ দেন, বানিজ্যিক থিয়েটারে যোগ দিতে। বলেন, এখানে একেবারে সরাসরি দর্শকের হাটে অভিনেতা নিজের অভিনয় ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার পরিমাপ করে নিতে পারেন। স্টার কর্তৃপক্ষকেও তিনি উত্তমের কথা বলেন। দুই, উত্তমকে স্টারে আনার ব্যাপারে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়েরও একটা ভূমিকা ছিল। ছবি বিশ্বাস তখন স্টার থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন। এই দুই থিয়েটারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বজনবিদিত। ছবিবাবু তখন করেছেন মিনার্ভায় 'ঝিন্দের বন্দী'। নিজে প্রধান দ্বৈত চরিত্রে আর ময়ুরবাহনের চরিত্রে আনবেন ভাবছেন উত্তমকে। এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সাবিত্রী উত্তমকে আনান 'শ্যামলী'তে। 'শ্যামলী'তে অভিনয় করতেন উত্তমের একদা অভিনয় শিক্ষক সন্তোষ সিংহও। নাট্যকার ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। যিনি এর আগে উত্তমের 'স্ট্রাগলিং' পিরিয়ডেই ফিল্মের সেটে তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন দুর্গাদাসের পরে বাঙালি নতুন নায়ক পেতে চলেছে। রঙমহলের সফল নাট্যকার দেবনারায়ণ সেই প্রথম এসেছেন স্টারে। নতুন চ্যালেঞ্জ তাঁর

সামনে। আর বহু খরচ করে সেই প্রথম মঞ্চে ‘রিভলবিং ডিস্ক’ লাগিয়েছেন স্টারের মালিক সলিল মিত্র (এ জন্য এই নাটকের বুকলেটের প্রচ্ছেদে থাকত একটি ঘূর্ণায়মান বৃত্তের ছবি।) ফলে খরচ তোলার চ্যালেঞ্জই উতরে দিয়েছিলেন উত্তমকুমার। বিজ্ঞাপনে যার নামের পাশে ‘ফিল্ম’ কথাটা ব্র্যাকেটে লেখা থাকত। ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ বিজ্ঞাপনে তাঁর নামটা দু-একজনের পরে যাচ্ছে বলে অনযোগ করলে, ঈষৎ হেসে উত্তম বলতেন, বিজ্ঞাপনটা না দেখে কাজটা দেখ। ‘শ্যামলী’ চলত বৃহস্পতি-শনি-রবি। এর আগে বুধবার করে অন্য একটি নাটক চালাত স্টার কর্তৃপক্ষ। তাকে বলা হত মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক। ‘শ্যামলী’র জনপ্রিয়তায় মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক বন্ধ হয়ে গেল স্টারে। আরও একটি প্রথা বদলাল। শনি-রবির টিকিটের থেকে দাম কম থাকত বৃহস্পতিবার। একে বলা হত ‘চিপ থিয়েটার’। ‘শ্যামলী’এসে বৃহস্পতিবারের টিকিটের দামও সমান করে দিল। স্টার ছাড়বার সময় ‘শ্যামলী’র স্ক্রিপ্টটি সেখানে অফিসঘরে রেখে আসেন দেবনারায়ণবাবু। স্টারে যখন আগুন লাগে, ভূস্মীভূত হয়ে যায় সেটাও। উত্তমের গ্রুপ থিয়েটার ‘শ্যামলী’ শুধু উত্তমের বানিজ্যিক মঞ্চে অভিষেক ঘটায়নি, ঘটিয়েছিল আরও দুজনের। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মজার কথা হল, এটা অনেকেই জানেন না, এঁরা তিনজনেই এর আগে একই দলে থিয়েটার করেছেন। সে দলের নাম ‘কৃষ্টি ও সৃষ্টি’। দলের মহলাঘর ছিল শ্যামবাজারে। দর্পণা সিনেমার পাশের গলিতে। অফিস সেরেই দৌড়ে আসতেন উত্তর কলকাতায়। মহলায়। বন্ধু শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে এই দলে আসা তাঁর। দলের আগের নাম ছিল ‘হুজুগে সঙ্ঘ’। পরে নাম বদলে ‘কৃষ্টি ও সৃষ্টি’। এই দলের উত্তম আর সাবিত্রীর একসঙ্গে প্রথম নাটক ছিল ভানু চট্টোপাধ্যায়ের(বন্দ্যোপাধ্যায় নন) ‘আজকাল’। সাবিত্রী তখন ‘উত্তর সারথী’ নামের এক দলের প্রযোজনায় অভিনয় করেন ‘নতুন ইহুদি’ নাটকে। তাতে অভিনয় করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ভানুবাবুই একদিন বন্ধু উত্তমকে নিয়ে এলেন স্টেজ রিহার্সাল দেখাতে। তখন অরুণ চট্টোপাধ্যায় উত্তমকুমার হননি। সাবিত্রীর

অভিনয় মুগ্ধ করল তাঁকে। সাবিত্রী দেবীর বাবার সঙ্গে কথা বললেন তাঁকে দলে পাওয়ার জন্য। বাবা বললেন মেয়েকে মহলায় নিয়ে যেতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে কাউকে, স্বয়ং উত্তম বা অরুণই সেই দায়িত্ব নিলেন। এই দলেই এরপর সাবিত্রী-উত্তম একসঙ্গে করেছেন 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। যাতে অভিনয় করতেন উত্তমের আরেক বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। করেছেন 'কানাগলি'। এ নাটকে শেষ দৃশ্যে এত তন্ময় হয়ে অভিনয় করতেন উত্তম, শোনা যায় মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন! ফলে 'শ্যামলী'তে দুজনের সাফল্য ছিল আসলে অবানিজ্যিক থিয়েটারেরই জয়। উত্তম-সাবিত্রী আবেকবার অবানিজ্যিক থিয়েটারে একসঙ্গে নেমেছেন। আর তা 'শ্যামলী'তেই! আর সেই নাটক করা নিয়ে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক ভাঙে ভাঙে আর কি! নাটক তখন সবে শত রজনী পার করেছে। উত্তমের পাড়ার নাট্যদল ছিল লিনার ক্লাব। এখানেই নাটক নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার হাতেখড়ি। উত্তম পুরনো নাটক দেখতেন, বয়স্কদের সঙ্গে করতেনও , কিন্তু পুরনো থিয়েটারের ধরাবাঁধা ছক, লম্ফঝম্ফ আর কৃত্রিম স্বরক্ষেপণে অভিনয় তাঁর পছন্দ ছিল না। চাইতেন সহজ স্বাভাবিক অভিনয়। যা ধরা আছে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমার ভেতর এক মঞ্চাভিনয়ের দৃশ্যে। আর তাই সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে এই 'লিনার ক্লাব' গড়া। এখানে 'সাজাহান' নাটকে উত্তম হয়েছেন দিলদার, 'কর্ণার্জুন'- এ শ্রীকৃষ্ণ, 'দুই পুরুষ'- এ সুশোভন। তা, এই লুনার ক্লাবের সে বছর সিলভার জুবিলি। উত্তম ঠিক করলেন 'শ্যামলী' হবে। সাবিত্রী থাকবেন, উত্তম নিজে থাকবেন। আর থাকবেন তাঁর বন্ধুরা। কথাটা জানতে পেরে সলিল মিত্র দুই পরিচালক শিশির মল্লিক আর যামিনী মিত্রকে দিয়ে বারণ করালেন। কিন্তু উত্তম বললেন এ নাটক করতে না দিলে তিনি দরকারে স্টার ছেড়ে দেবেন। সরযূবালা উত্তমের পাশে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়ালেন টেকনিশিয়ানেরা। 'শ্যামলী' হল শেষমেশ লিনার ক্লাবে। মঞ্চে ফিরে আসা ১৯৬৮-তে দেবনারায়ণ গুপ্তকে ফোন করে উত্তম চেয়েছিলেন আরেকবার স্টারে ফিরে আসতে। বলেছিলেন

একটা নাটক লিখতে যাতে তাঁর চার-পাঁচটা ‘এন্ট্রি’ থকবে। সে নাটক অবশ্য হয়নি। কিন্তু উত্তম তাঁর নাট্যক্ষুধা মিটিয়ে নিয়েছিলেন নবগঠিত ‘শিল্পী সাংসদ’- এর মাধ্যমে। প্রতি বছর নাটক নামত এই ব্যানারে। নাট্য-শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হত। কোনও কারণে টাকা তোলার দরকার হলেই নাটক নামত। ১৯৭২ সালে রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তিতে ‘শিল্পী সংসদ’ পর পর তিন সন্ধ্যায় নামাল তিনটি নাটক। বিশ্বরূপা মঞ্চে। তিনটিরই পরিচালক উত্তমকুমার। ‘চারণকবি মুকুন্দ দাস’, ‘সাজাহান’ (এতে নাম ভূমিকায় ঠাকুরদা মিত্র, ঔরঙ্গজেব মহেন্দ্র গুপ্ত আর দিলদারে বিকাশ রায়), ‘চরিত্রহীন’। তিনটিই ‘ক্লাসিক’ নাটক। এর কোনওটাতে অভিনয় করেননি অবশ্য উত্তম। তবে সে খেদ মিটল পরের বার। ‘আলিবাবা’ নাটকে। এ নাটকে জয়শ্রী সেন মর্জিনা। আর দু’দৃশ্যের মজার চরিত্র বাবা মুস্তাফা স্বয়ং উত্তমকুমার। রবীন্দ্রসদনে শো হল। নাটককে ভালবেসে রোমান্সের রাজা তখন মঞ্চে কুৎসিতদর্শক এক বৃদ্ধ মুচি! চমকে গিয়েছিল দর্শক।

প্রকৃতি বিড়ম্বিত এক হতভাগ্যের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘উল্কা’ নাটকটিতে, যার পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি এবং নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত। সুদীর্ঘ চারশো রজনী ধরে কোন একটি নাটকের অভিনয় কোনো দেশেরই সেই নাটকের সাফল্যের চরম অভিব্যক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। নাটকটি জোর করে বিজ্ঞাপনের আতিশয্য দিয়ে কিছুদিন চালানো যেতে পারে কিন্তু সুদীর্ঘ চারশো রজনী ধরে একটি নাটকের নিরবচ্ছিন্ন অভিনয় একমাত্র অতি সার্থক নাটক ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তখন সারা শহরে একই কথার আলোচনা ‘উল্কা’-র অনন্য সাধারণ সাফল্য। সে সময় বৈজয়ন্তি-উৎসবের মূলে ছিল তিনশো নিরানব্বইটি অভিনয়ের একভাবে সমন্বিত সার্থকতা। প্রতিটি অভিনয় রজনীতে যে- প্রশংসা লক্ষ্য করা গিয়েছিল চারশো রজনীর সার্থকতায় তা একটি উৎসবে পরিণত হয়। এর মূলে রয়েছে নাট্যশিল্পী, পরিচালকবৃন্দ ও অভিনেতাদের মিলিত সহযোগিতা। অভিজাত রঙ্গমঞ্চ রঙমহল বাংলার নাট্যজগতে এক

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এটা সামান্য কথা নয়, সর্বসাধারনের স্বীকৃত তাদের বিনীত দাবী। এই নবীনতর উদ্দেশ্য যে কল্পনা নয়, 'উল্কা' ও তার পূর্ববর্তী দূরভাষিনী তার নিদর্শন। বাঙালী জনসাধারনের সহজাত নাট্যপ্রীতি ও সুরুচিবোধ সম্বন্ধে পরিচালক মণ্ডলীর মনে কোনদিনই বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রঙ্গগৃহের উদ্যোক্তারা এই মনোরম রুচিবোধ ও নাট্যপ্রীতিকে নূতন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। সে সময় নাট্যজগতে হতাশা ও একঘেয়েমির আবহাওয়া দেখা দিয়েছিল। নাটকের মধ্যে ছিল পৌরুষের দীনতা, নাটকের মধ্যে এসেছিল একটা বিরক্তিকর মন্থরতা এবং দর্শকের পদক্ষেপে ছিল কুণ্ঠা ও উৎসাহের অভাব। রঙ্গমঞ্চের ও নাটকের অভিনয়ের আত্মবিশ্বাসের অভাব এত বেশী দেখা দিয়েছিল যে এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সংশয়ের উদয় হয়েছিল নাট্যমোদীদের মনে। এই হতাশা বোধ এবং পরাজয়ের দুঃস্বপ্নকে দূর করে আত্মগতি বোধ জাগ্রত করার ব্রতে 'রঙমহল' সাহসভরে এগিয়ে এসেছিল। কাজটি কিন্তু সহজ ছিল না। বহু বছরের পুঞ্জীভূত defeatism ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্লীব মনোভাব এই নতুন গঠন কার্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আত্মপ্রবদ্ধ পরিচালক মণ্ডলীর অন্তরে ছিল তারুণ্যের পরাজয়হীন দৃঢ়তা। অতি উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রথমেই নাট্যগৃহটি সংস্কার করা হল। উদ্যোক্তারা এই জনপ্রিয় রঙ্গগৃহটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দর্শকদের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যয় সম্পর্কে আকুণ্ঠ মনোভাব রেখে তাঁরা এই কাজে হাত দিলেন এবং বঙ্গমঞ্চকে পরিপূর্ণ ভাবে গড়ে তুললেন। ফলে রঙমহল অভিজাত রঙ্গগৃহ বলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করল। রঙমহল হয়ে উঠেছিল বাংলার রম্যতর প্রমোদ নিকেতন। এরপরে দর্শক সমাজের বিভিন্নমুখী রুচিবোধকে তারা রঙমহলের নাট্যভিনয়ের মধ্যে এনে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করেন। প্রেক্ষাগৃহের সৌকর্য বিধান করে অভিনয়ের সমগ্র ধারাকে তাঁরা নূতন খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চ ও রূপসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের থিয়েটারে যে সকল বিস্ময়কর

পরিবর্তন আনা হয়েছিল বলে শোনা যায় তার সবকিছু না হলেও অনেকটা এই রঙ্গমঞ্চ গ্রহন করে নিয়েছিল। উল্কা নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ প্রমাণ করেছেন যে আধুনিক অভিনয় পদ্ধতি ও মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে তাঁরা শুধু সচেতন নয়, তাঁরা এই আধুনিকতাকে তাদের রঙ্গমঞ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলত 'উল্কা' সার্থক নাটক হিসাবে জনপ্রিয়তা উচ্চ শিখরে পৌছে ছিল। অসামান্য জনসমাদারধন্য এই নাটক 'রঙ্গমহল' কর্তৃপক্ষের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এক মনোরম এক্সপেরিমেন্ট। মনোহর দৃশ্যপট, মুগ্ধকর আলোক-সম্পাত, নিয়মানুগ মঞ্চ ও রূপসজ্জা, চিত্তাকর্ষক অভিনয়, সুর ও ছন্দের অপূর্ব লালিত্য, রুচিকর পরিকল্পনা ও পরিচালনা এবং নাটকখানির অন্তর্নিহিত শক্তি 'উল্কা' এই সবের সুন্দর সমন্বয়। সে সময় 'উল্কা' প্রথমশ্রেণির নাটক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল- যা অপ্রতিহত গতিতে দর্শকদের প্রশংসার স্রোতে বয়ে চলছিল। সংবাদপত্রে ও নাট্যরসিকদের সমাজে 'উল্কা'-র গুণমান সম্পর্কে বহু আলোচিত হচ্ছিল। ৩৯৯ রজনী ধরে যে নাটকের অভিনয় ছেদহীন গতিতে অভিনীত হয়েছে তার গুণাগুণ নিয়ে নতুন করে অলোচনার আর প্রয়োজন হয় না। তবুও চারশো রজনীর বৈজয়ন্তী উৎসবে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে পারে- এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার মূলে কি? "উল্কা" চিরন্তন মানব মনের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি। করুণরসে নিসিক্ত এই চিত্তহারী মঞ্চ-আখ্যায়িকার মধ্যে সাধু ও শয়তান, সুন্দর ও অসুন্দরের পাশাপাশি অবস্থান এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে তা দর্শকের মনকে বিমুগ্ধ করতে বাধ্য। মানব মনের এই চিরন্তন রহস্যের সন্ধান জানেন কুশলী নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রতি ছত্রে যে কল্পনার আবেগ ও কারুণ-মাধুর্য্য তিনি অত্যন্ত আবেগ দিয়ে সাজিয়েছেন তা আমাদের কাছে আশাতীত এক বিষয়। বাংলা নাটকের গতানুগতিকতা ত্যাগ করে 'উল্কা'-র নাট্য স্রোত বয়ে গিয়েছে অনাস্বাদিতপুর্ব-রসমন্দাকিনীরূপে। তাই দর্শক ও সমালোচকের কাছে নাটকটি নতুন নাট্যধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলেই মনে হয়। এই নাটকে 'অরুনাংশু'- দীপক মুখোপাধ্যায় নাটকের কেন্দ্রচরিত্র,

যিনি জন্মবধি একা। ভাগ্যের বিড়াম্বনায় সে অত্যন্ত কুৎসিত দেহাবয়ব নিয়ে জন্মেছেন। মায়ের অগোচরে পিতা তাকে বহু দূরে এক সন্ন্যাসীর পরিচালিত আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেইখানে সন্ন্যাসীর শিক্ষায় ও আদর্শে অরুনাংশুর অন্তরে জন্ম নিল দয়া, কারুণ্য ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য্য। দীপক মুখোপাধ্যায় কুৎসিত রূপের ছদ্মবেশে অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উনার কথা বলার ভঙ্গি –" আমি ভালবাসি এই রূপ-রস-গন্ধে ভরা সুন্দর পৃথিবীকে ও তার বুকে প্রতিপালিত মানুষ।"[২] সাধারণ মানুষের মতো সে জীবনের কাছে চেয়েছিল স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা। কিন্তু চারিদিকের অবজ্ঞা ও ঘৃণা তাকে বিমূঢ় করে দিল। অন্তরের মাধুর্য্য কিন্তু তার বিন্দুমাত্র কমেনি। ঘাতকের হাত থেকে ছোট ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে এই বলিদান, কুৎসিত-সুন্দর যুবক আত্ম বিসর্জন দিল। দেরি হলেও অরুন মাতাপিতার মুখে নিজের সন্তানের স্বীকৃতি শুনে গিয়েছিল। "মা, মা" করতে করতে সে শেষ নিদ্রায় ঢোলে পড়লো। যা দর্শক সমাজে তাঁর অভিনয় এক অন্য মাত্রায় ভূষিত হয়েছে। আপাতত নাটকে অরুনাংশুর দেহ ও মনের এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে যে পরম শিক্ষা লুকিয়ে আছে, সেটাই উল্কা নাটকের মূল সুর। যাকে কেন্দ্র করে যে ভালো-মন্দ তা নাটকের নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রঙমহলের শিল্পী বৃন্দের একনিষ্ট সহযোগিতা। এদের প্রাণঢালা অভিনয় এই নাটকের পরম সম্পদ এবং অসম্ভব জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ। প্রতি অভিনয় সন্ধ্যায় পরিপূর্ন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সম্মুখে ঐকান্তিক নিষ্টা নিয়ে শিল্পিবৃন্দ অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে কোন ছেদ নেই- অক্লান্ত সহযোগিতার ভাবটিই ফুটে উঠেছে। কলা-কৌশল ও অভিব্যক্তির দিক দিয়ে অভিনয় বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় এদের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে কাজটি পরিচালনা করা। প্রত্যেক শিল্পী নিজের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চরিত্রকে প্রানবন্ত করে তুলেছেন। তাই 'উল্কা' এত সুসংগঠিত, সুসামঞ্জস্য ভাবে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক চরিত্র নিজ নিজ ভূমিকার মূল বক্তব্যটি দর্শকের সামনে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

করেছেন। শক্তিমান ও উদাত্তকণ্ঠ নট মহেন্দ্র গুপ্ত রাজীব ঘোষের ভূমিকায় অন্তনিহিত দ্বন্দ্বটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। নিজের সন্তানকে বঞ্চিত করার জন্য তার সারাজীবন ধরে হাহাকারের মুহূর্তগুলি দর্শকের চিত্তকে অশ্রুসজল করে তোলে। অভিনেত্রী শিপ্রা দেবীর মনোজ্ঞ অভিনয়ে মাতৃত্বের যে করুন চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা নিবিড়তা দর্শককে অভিভূত না করে পারে না। চৈনিক রূপ সজ্জায় জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা জহর রায়ের ক্রিয়াকলাপ দর্শকদের হাস্যচকিত ও পরিশেষে বিমোহিত করে রাখে। অনবদ্য অভিনয় ও দেহসজ্জার অভিনবত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দীপক মুখোপাধ্যায়ের অরুণাংশু চরিত্রটি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবার উপযুক্ত। এই চরিত্রে অভিনয় আজ পর্যন্ত তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মিডনাইট হোটেলের ক্রূর অভিসন্ধি গনেন বোসের চরিত্রে জীবেন বোস, পথভ্রান্ত সুবিরের চরিত্রে রবীন মজুমদার, হাস্যরসিক দাদুর চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়, দরদী ডাক্তারের চরিত্রে দীলিপ চৌধুরীর অভিনয় প্রানবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থক। অন্যান্য চরিত্রে গীতা সিং, কেতকী দত্ত, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, আদিতা ঘোষ, সৌরেন ঘোষ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, ইরা চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা দেবী সুন্দর অভিনয় চাতুর্য্যের পরিচ্চয় দিয়েছেন। নৃত্য ও সংগীতের দিক দিয়ে বিচার করলেও ‘উল্কা’ একখানি উপভোগ্য নাটক। রবীন মজুমদার ও প্রশান্তকুমারের সুললিত কণ্ঠ-সংগীত এই নাটকের বিশেষ আকর্ষন- প্রসিদ্ধ গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সংগীত রচনা করেছেন। অতীনলাল- পরিকল্পিত নৃত্য ও “মিডনাইট হোটেল”- দৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সমস্ত অভিনেতা ও কলাকুশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ‘উল্কা’ নাটকটি যথাযথ ভাবে ফুটে উঠেছে।

জোছন দস্তিদারের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘দুই মহল’। নাটকটির রচনাকাল ১৯৫৫, এবং প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। নাট্যকার বলেছেন- গণনাট্য আন্দোলনের ধারক হিসেবে দুই মহল যথার্থ পংক্তিতে একটি সংখ্য হিসেবে স্থান পাবে। ধনী মানুষ দিনের বেলা প্রাচুর্যে, সুখে জীবন

কাটায়- রাত্রি হলেই শুরু হয় সমাজ বিরোধী দুষ্কর্ম। সর্ভারা নিপীড়িত জনমানসের প্রতি দায়বদ্ধতার নিদর্শন- জনপ্রিয় প্রযোজনা। বিশ্বরূপার নাট্য প্রতিযোগিতায় বৈশাখীও নাম দিয়েছে ১৯৫৮ সালে। বিচারক মন্মথ রায়, মনোজ বসু, শোভা সেন, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুখী প্রধান, অজিত ঘোষ, সাধন ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়- দুই মহল সকলেই ভালো লেগেছিল। রূপান্তরীর দ্বিতীয় প্রযোজনা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। নাটকের মধ্যে একাধিক প্রতিবন্ধী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। যাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছোনেরাম। বয়স ৪০/৪৫, কাচা-পাকা চুল, বাঁ হাত নূলো এবং ডান পা খোঁড়া। ছোনেরাম চরিত্রে অভিনয় করেন শ্রী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। যা এই নাটকের মূল আকর্ষন। নাট্যকার নাটকের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে কিছু ধনী অসাধু ব্যবসায়ীরা সাধারন মানুষদের অপহরণ করে এনে নির্জাতন করছে, পাশাপাশি তাদের প্রতিবন্ধীতে পরিণত করছে যার অন্যতম উদাহরণ ছোনেরাম চরিত্র। ছোনেরামের ব্যবসায়িক (ভিক্ষা) ক্ষেত্রে যখন ভুল হল রঞ্জন সান্যাল (অসাধু ব্যবসায়িক) হাতটা ভেঙে দেয়, দ্বিতীয়বার জনতা তার পা খোঁড়া করে দেয়। সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত নাটকের মধ্যে মঞ্চ জুড়ে খোঁড়ার অভিনয় করেছিলেন। নানান ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে হাত-পা ব্যবহার করে তিনি একজন যথার্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্পিত চরিত্রে অভিনয় করেন। লালুয়া চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং জোছন দস্তিদার। তাঁর এই অনবদ্য অভিনয়ে দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। জোছনবাবু ছাড়াও যারা প্রতিবন্ধী চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন- শ্রী সলিল রায়, নীপু চৌধুরী, শ্রী সোমেশ ঘোষাল, সুনীল বাজপেয়ী, প্রণব মজুমদার,শ্রী জ্যোর্তিময় ও সুখেন্দু রায়চৌধুরী। প্রত্যেকেই ভিন্নধর্মী প্রতিবন্ধীর অভিনয় করেছেন নাটকে। কেউ খোঁড়া, কেউ বোবা, কেউ অন্ধের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটককে সার্থক করে তুলেছেন।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি প্রহসনধর্মী নাটক হল মৌন মুখর। নাটকের মধ্যে যে প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে সে বোবা কিন্তু কালা নয়। মিনতি দেবী সমস্ত নাটকের মধ্যে বোবার অভিনয় করেছেন। নাটকের মধ্যে চরিত্রটিকে নানান বস্তুর সাঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল- যাদুঘরের মুর্তি। কারণ মুর্তি কথা বলতে পারে না। কিন্তু এই অভিনয় ক্ষণস্থায়ী কারণ নাটকের মধ্যে যে বোবা চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন অর্থাৎ কথা বলার ক্ষমতা পেয়েছে।

সুন্দরমের আর একটি প্রযোজনা মনোজ মিত্রের 'নীলকণ্ঠে বিষ', নাটকটি ১৯৬০ সালে লেখা। প্রকাশিত হয় গান্ধর্ব পত্রিকায়। মনোজ মিত্র বলেছেন- "ক্রিশ্চান পাদ্রীকে নিয়ে লিখেছি, ময়মনসিং এ দেখেছিলাম ভদ্রলোককে- তাকে নিয়ে লিখেছিলাম নাটকটি.....ঐ পাদ্রী থেকে খানিকটা কল্পনা, ওর মৃত্যুর সীনটা পুরো বানিয়েছিলাম।"[৩] বানিয়ে তোলা সেই কাহিনীতে দেখা যায় এক জনমানবহীন পরিত্যক্ত চার্চে পাদ্রী ফাদার লংম্যানের নির্বাসন হল, জনৈক নারী লোরাকে ভালোবাসার অপরাধে। ক্যাথলিক চার্চের ধর্মযাজক মধ্যবয়সী এই মানুষটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতবন্ধিকতাকে তুলে ধরেন। একটি পায়ের ক্রচের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে হয় তাঁকে। সমস্ত নাটক জুড়ে ক্রচের মাধ্যমেই অভিনয় করে গেছেন। নির্বাসনের মুহূর্তেই জেনে গেছেন যে লোরাও বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে চলে গেছে সাতসমুদ্রের ওপারে। তবু লোকটি নিছক ধর্মের আশ্রয়ে নয়, মানুষের সান্নিধ্যে বাঁচতে চান। আর তা চান বলেই রাস্তা থেকে রোগক্লিষ্ঠ মানুষদের আশ্রয় দিয়ে নিয়ে আসেন জনহীন সেই চার্চের ভাঙা বাড়িতে। এভাবেই আসে সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা নিয়ে দুঃখীরাম, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ হরিপদ, বা আরো কেউ কেউ। তবে শুধু আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নয়, অনুশাসনের কঠোর নিয়মও তিনি চালু করে দেন। উদ্দেশ্য- এদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখানো। কিন্তু ফাদারের সেই কঠিন পরিশ্রমী জীবনচর্চায় চার্চে আশ্রয় পাওয়া মানুষগুলোর কি প্রতিক্রিয়া ? চার্চের ঐ পরিবেশ সত্যিই কি তাদের ভরসা

জোগায়? বরং তাদের ভরণপোষণের জন্যে ফাদার পরিকল্পিত পরিশ্রমের হাত থেকে যে কোনো উপায়ে পরিত্রান পেলে তারা বেঁচে যায়। আসলে এরা তো ছিল মাখনলালের ভিখারী ব্যবসার উপাদান। এদের হাত দিয়েই সেই অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীর বিপুল রোজগার। আর এরাও এই রাস্তার জীবনে আভ্যস্ত হতে হতে সহায় সম্বলহীন ফাদারের আস্তানায় অর্ধেকদিন প্রায় অনাহারে কঠর নিয়মে সুন্দর শান্ত দিনযাপনের কল্পনায় বাঁচতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এরকমই পরিস্থিতিতে সেখানে আসে এক ডাক্তার। তিনিও ফাদারের মানুষের সান্নিধ্য পাবার তাগিদকে সঠিক বুঝতে পারেন না। বরং তাঁর মনে হয় এই পাদ্রী লোকটি নিতান্তই মায়ামমতাহীন এক মানুষ। এতগুলি লোককে এভাবে বিনা চিকিৎসায় ফেলে না রেখে উচিত হাসপাতালে গিয়ে এদের চিকিৎসা করানো। কিন্তু কোনো ফল হয় না। যদিও ডাক্তার চলে যাওয়ার পর ফাদার ক্রমেই বুঝতে পারেন তার যুক্তিগুলো, তবুও অধিকতর আগ্রহে তিনি আঁকড়ে ধরতে চান আশ্রিত মৃত্যুপথযাত্রী পঙ্গু লোকেদের। রাত জেগে পড়তে থাকেন ডাক্তারের ফেলে যাওয়া বই। কল্পনা করেন নিজেকে চিকিৎসকের ভূমিকায়। স্বপ্ন দেখেন হাসপাতাল গড়ে তোলার।এহেন সময়ে দ্বিতীয়বার আসেন সেই ডাক্তার। এবার আর একা নয় সঙ্গে পুলিশ অফিসার আর আশ্রিত মানুষের মিছিল। খবর হল সরকার অথর্ব অসহায়দের হাসপাতাল তৈরি করেছেন- ফাদারের কাছে থাকা পঙ্গু মানুষেরা সেখানে নির্বিঘ্নে আশ্রয় পেতে পারবে। অবাক ফাদার আরোজানলেন যে তিনিই হবেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ। কেননা তিনি অথর্ব, রোগ জর্জরিত মানুষদের দূরে ঘৃণায় সরিয়ে দেননি বরং তাদেরকে প্রিয়জনের মতো নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন। তবু ফাদারের লোকায়নে যাওয়া হয় না। এবার বাধা তার নিজের শরীর – কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত তিনি। আর সেই রোগ নিয়ে মানুষের সংস্পর্শে আসবেন এমন স্বার্থপরতার কথা ফাদার মনেও আনেন না। তাই ডাক্তার, পুলিশ অফিসার, সাধারন মানুষ সকলকেই নিরাশ করে তিনি রয়ে যান সেই নির্জন, পরিত্যক্ত চার্চে, একাকী। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে মানুষের সংস্পর্শ থেকে

সরিয়ে নিতে তিনি বাধ্য হলেন। এ যেন পুরাণের মহাদেবের মতো বিষপান করে তিনি নীলকণ্ঠ। মানুষকে কাছে পাবার সাধ তার কাছে আতুরদেরও গ্রহনীয় করে তুলেছিল।

সুন্দরম্-এর একটি অন্যতম প্রযোজনা মনোজ মিত্রের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'। মনোজ মিত্র শুধু নাট্যকার নন, তিনি একাধারে অভিনেতা, পরিচালকও। আরও বেশি যা বলার তা হল, মনোজ মিত্রের নাটক মানে একই সঙ্গে যা ভাবায় এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার মানে উনার নিজ স্টাইলে মজার মজার গল্পে প্রত্যেকবার বলেন। উপাদান হিসেবে তিনি ভূত, রুপকথা, প্রেম, জন্ম ও মৃত্যু ব্যবহার করেন। অলকানন্দার পুত্রকন্যা নাটকটি এদিক থেকে একটু অন্যরকম। কারণ নাটকটিতে মজা নেই। রয়েছে চাপা টেনশন সারাক্ষণ ধরে। অলকানন্দা এক অদ্ভুত মহিলা। তার নিজের ছেলে-মেয়ে নেই। তার পালিত পুত্র শুভ, পালিত কন্যা মানসী। অলকানন্দার স্বামী রজনীনাথ একজন পঙ্গু ব্যক্তি। এসব নিয়ে অলকার সংসার কোন ভাবে চলে যেত। ভাঙন এল পরে। সেই সঙ্কটের সময়ে অলকানন্দা ভাঙলেন না। গল্পের কথায় পরে আসা যাবে, অভিনয়ের কথা হোক। এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রজনীনাথের চরিত্রে রঞ্জন রায়। মনোজবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি এই রকম একজন অভিনেতাকে উপহার দিলেন। নাটকে পঙ্গু সারাক্ষণ বসেই থাকেন, মুখ কাঁপে, কথা জাড়িয়ে যায়। উনার অভিনয় মঞ্চের একটা নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে। ইজিচেয়ার ঘিরে রজনীনাথের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে গড়ে উঠেছে একটা পৃথক সংসার। ঘরের ঐই অংশটা দেখলে মনে হয় যেন ঘরের মধ্যে আর একটা ঘর। বয়স রজনীনাথের গোটা পঞ্চান্ন। এক মাথা কোঁকড়া কাঁচা চুল। মুখখানা হাঁড়ির মতো ফাঁপা। চোখের জল গড়াতে গড়াতে মোমবাতির গায়ের মতো দাগ জমেছে গালের ওপর। কোলের ওপর একটা রবারের বল, বেশীর ভাগ সময় রজনীনাথ তার অকেজো আঙুলগুলো দিয়ে বলটাকে টেপাটেপি করে। ওটা তার চিকিৎসার অঙ্গ। পাশাপাশি চিত্রা সেনও খুব ভালো

অভিনয় করেছেন। তিনিই অলকানন্দা। শর্মিলা মৈত্র করেছেন দেবাহূতি। দেবাহূতি অলকানন্দার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। দেবাহূতির বাচ্চা থাকে অলকানন্দার ফ্ল্যাটে। কারণ, দেবাহূতি স্বামীর সঙ্গে থাকেন না। তিনি রাত করে বাড়ি ফেরেন। মাঝে মাঝে তিনি থাকেন মাতাল। ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা চটে যান। বাড়িওয়ালা খারাপ মন্তব্য করেন। অলকানন্দার ছেলে শুভ এরই মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছে। সে চক্রান্তের খপ্পরে পড়েছে। সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দাদা জয়দীপ। শুভ-র চরিত্রে সুব্রত চৌধুরী, জয়দীপের চরিত্রে দীপক দাস বেশ ভাল। দেবাহূতির ভূমিকায় শর্মিলাও ভাল করেছেন। মানসী স্টেজে নেই। শুধু তার নাম শোনা যায়। বিয়ের পর স্বামীগৃহে অপমানিতা তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাদল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ মিত্র। তাঁর অভিনয় তো অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি। আরও চরিত্র আছে। গল্পের বুনোন আছে। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনা।একটি ঘর, ঘরটি নিখুঁত। কোনও নিয়ম ভাঙা নয়। যা নিঃসন্দেহে একটি ভাল নাটক।

মনোজ মিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক গন্ধজালে। নাটকটির রচনাকাল ২০১০, প্রথম প্রযোজনা ৩০ আগস্ট ২০১২ সালে বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনায়। নাটকটির মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ প্রতিবন্ধী চরিত্রের অভিনয় দেখা যায়, যারা দৃষ্টিহীন। সমস্ত নাটক জুড়ে কেবল অন্ধতার ভান করে চলা। পাশাপাশি নাটকের আকর্ষনীয়তা বৃদ্ধি পায় দুই অন্ধের গনবিবাহের মধ্যে দিয়ে। নীলকণ্ঠ জন্মান্ধ নয়। এক দুর্ঘটনায় তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ গড়ে তুলেছে নিজস্ব এক বৃত্ত। মনের জোরে হাতের কাজ সে শিখে- বেতের কাজ, জাল বোনা এই সব মিলিয়ে তার মোটামুটি ভালোই রোজগার। নিজের টাকায় ছোট একটি বাড়িও করেছে। তার অধীনে কয়েকজন কর্মচারিও থাকে। তবে প্রত্যহের এই প্রযোজনীয় রসদ সংগ্রহের কাজ করার সামর্থ্য ছাড়াও তার রয়েছে এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সে চোখে দেখতে না পেলেও গন্ধ শুঁকে

বুঝতে পারে অনেক কিছুই, এমনকি চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে যা ধরা দেয় না এমন অনেক কিছুই সে গন্ধ শুঁকে অনুভব করতে পারে। বুঝতে পারে নানা অনুষঙ্গের আসল রহস্য, ধরতে পারে নানা উপকরণের উপস্থিতির প্রকৃত অর্থ। আর তখনই পঙ্খীর মনে হতে থাকে তবে কি তার জীবনের এক লজ্জাকর ঘটনা যে স্মৃতিচিহ্ন সে এতদিন আগলে রেখেছে তার মীমাংসা সম্ভব? পঙ্খীর বিয়ের আগে এক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তার দিদির বাড়িতে থাকতেই। কোনও এক অন্ধকার রাতে তার কৌমার্য হরণ করেছিল কেউ। কিন্তু অন্ধ পঙ্খী বুঝতে পারেনি সে কে। তবে যে তার সব লুটে নিয়েছিল তার গায়ের গেঞ্জির একটা টুকরো সে রাতে ছিঁড়ে নিয়েছিল পঙ্খী। নীলকণ্ঠর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সে অনুরোধ করে ওই লোকটিকে চিহ্নিত করতে। প্রথমে রাজি না হলেও পরে নিজের বাড়িতে নতুন বৌকে নিয়ে রওনা হবার সময় তাপসের হাতে গেঞ্জির টুকরোটা দিয়ে বলে- "এই মোড়কটা রাখুন দাদা- এটা আপনার জিনিস।"[৪] কিন্তু নীলকণ্ঠ অতীতে আর ফিরে তাকাতে চায় না। যে ভাবে তাকায়নি ওর নিজের জীবনেও, চোখ হারিয়ে নিজেই আবার খুঁজে নিয়েছিল বাঁচার পথ। তাই তাপসের কৃতকর্ম জানতে পারলেও সে অতীত খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায় না। নীলকণ্ঠ বোঝে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হয় পৃথিবীতে। মানুষের পাশে মানুষ না থকলে সে তো সেই অন্ধকারে থাকার মতো। নীলকণ্ঠ আর অন্ধকারে ফিরতে চায় না। "আপনারা আমার পরমাত্মীয়- পরম আপনজন। কোনোদিন কোনো করণে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না দাদা- আবার ওই অন্ধকারে যেন ফিরে না যেতে হয়।"[৫] প্রত্যেক নাটকেই শিল্পী এবং কলাকুশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সহযোগিতায় নাটকগুলি সার্থকতা লাভ করেছে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. তাপস ভৌমিক, বাংলা নাটক ও মঞ্চ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কল্কাতা-৫৯, পৃ. ১৮৯

২. নীহাররঞ্জন গুপ্ত, উল্কা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২,পৃ. ১১

৩. বাসবী রায় ও শুভ্র মজুমদার, নাটকের নানা রং, নাট্যশোধ সংস্থান, বিধান নগর, কোলকাতা-৯১, পৃ. ৩৫

৪. মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৭৯

৫. ঐ পৃ.২৮০

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তব জীবন ও থিয়েটার জীবনে প্রতিবন্ধী চরিত্রের তুলনা

নাটক জীবনের বহু বিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ। এমন নিবিড় ভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ আর কোন সাহিত্য শাখায় পাওয়া যায় না, কারণ নাটক মিশ্রশিল্প। শব্দ ও অর্থের সহযোগে কল্পনায় অনুভূত জীবন-অভিজ্ঞতার রূপায়ন ও জনচিত্তে তাঁর সঞ্চারণ কাব্য-উপন্যাসের মতো নাটকেরও মূল উপজীব্য। তবে জীবনের রূপ বা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ নাটকে বিশেষ প্রাধান্য পায়। নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়ায়, দৃশ্য বা অদৃশ্য বহু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম, অনির্দেশ্য বা অস্পষ্ট ভাব ব্যঞ্জনার সংকেতে, বহু বিচিত্র সমস্যার আলোচনায় চলমান জীবনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নাটকে দৃশ্য হয়ে ওঠে। যে কোন নাট্যকারের নাটকে এই দিকগুলি সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করে থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে অভিনেতার কাজকে মূলত পাঁচটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকেঃ

১. তিনি সত্যিকার শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এর সাথে যুক্ত থাকে কণ্ঠস্বরের কেরামতি। অর্থাৎ শরীরযন্ত্রের কাছে তার দাবী স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। নিজের শরীরের কাছে অভিনেতার দাবী শরীরের গড়পড়তা দৈনন্দিন ব্যবহার-সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

২. তিনি অনুকরণ ক্ষমতার প্রয়োগ দেখান। অর্থাৎ এমনসব শরীর-ভঙ্গি এবং ক্রিয়া তাকে করে দেখাতে হয় যা আদৌ তার নিজের নয়।

৩. তিনি কল্পনাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এমন স্থান-কাল-চরিত্র পরিস্থিতিতে বিচরণ করেন যা তার নিজের নয়।

৪. তার নিজের স্বভাবের মধ্যে পড়ে না এমন আচরণ করে দেখাতে হয়।

৫. উল্লেখিত এরকম সব ক্রিয়াকলাপরত অবস্থায় তিনি অন্য মানুষ অর্থাৎ অন্যান্য অভিনয় শিল্পী এবং দর্শক সাধারণের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিনেতার কাজ নির্ভর করে- ১. শারীরিক স্বাস্থ্য-সবলতা এবং নমনীয়তা ২.অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ৩. কল্পনাশক্তির ব্যাপ্তি ৪. কল্পনার উপলক্ষ্যসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে শরীরে প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ৫. স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের সাথে বিনিময়ের ক্ষমতা-র উপর।

এইসব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির অনুশীলনের পন্থা নির্ভর করে প্রযোজনাধীন নাটকের চাহিদা, নাট্য পরিস্থিতি এবং প্রযোজনা আঙ্গিকের উপর। অভিনেতার প্রস্তুতির বৃহত্তর অংশ সম্পর্কযুক্ত থাকে নাটকের বিষয়বস্তুর সাথে। ফলে তাকে পাণ্ডুলিপির বিশদ পাঠের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ চরিত্র, পরিস্থিতি এবং আচরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটক, প্রযোজনা ও চরিত্র সম্পর্কে তার বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে নিতে হয়। তবে এর মধ্যে আমার বর্তমান ভাবনার ক্ষেত্রটি হচ্ছে অভিনেতা নাটকে তার করণীয় সম্পর্কে যা বোঝেন, কীভাবে তিনি সেটার রূপায়ন ঘটান; কীভাবে তিনি নাটক সম্পর্কে তার মনোভাব ও ভাবনাকে শারীরিক ক্রিয়ায় রূপান্তর করেন; কিভাবে অন্য অভিনেতা এমনকি দর্শক প্রতিক্রিয়ার সাথে নিজ ক্রিয়াকলাপের তারতম্য ও সমন্বয় ঘটান।

অভিনেতার কাছে তার ক্রিয়াকলাপের কোনোটিই অকল্পনীয় নয়। সব কিছুই দৈনন্দিন জীবনে ঘটে চলেছে। যে প্রক্রিয়ায় তিনি তার কাজ এগিয়ে নেন তা সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অভিনেতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রমটা হচ্ছে এখানেই যে, উপস্থাপনের লক্ষ্যে তিনি সচেতনভাবেই এইসব ক্রিয়াকলাপ নির্বাচন করেন এবং নিয়মিতভাবেই দর্শকের সামনে এর

পুনরাবৃত্তি ঘটান। যেখানে দৈনন্দিন জীবনে এই সব ক্রিয়াকলাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ বা উদ্দীপনাজাত এবং জীবনের আর্থ সামাজিক প্রয়োজনের শৃঙ্খলাধীন, সেখানে অভিনেতা নিজেকে প্রকাশ করেন সীমিত নাট্যপরিসরে ক্রিয়াকল্পের মধ্য দিয়ে এবং সে অর্থে তিনি একটি কৃত্রিম পরিস্থিতির অধীনে বিচরণ করেন। থিয়েটার বাস্তবতার কৃত্রিম পরিবেশ অভিনেতার উপর কিছু চাপ সৃষ্টি করে। তার কাজ দর্শকের অবিরাম নিরীক্ষার অধীন। ব্যর্থতার শঙ্কা তার নিত্যসঙ্গী। কল্পনাশক্তির প্রয়োগে তিনি প্রতিনিয়ত এমনসব জটিল সামাজিক ও ব্যক্তিক পরিস্থিতিতে বিচরণ করেন যার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হয়তো তার নেই। প্রায়শ জনসম্মুখে তাকে এমন শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয় বা ভান করতে হয় যার জন্য তিনি কখনো শিক্ষানবিশি করেননি। ভাবা আর করার মধ্যে কোনো ফাঁক না রেখে নিমেষেই মানব আচরণের নানাবিধ ভঙ্গি যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থাপন করতে হয় তাকে যা কিনা বাস্তবে ঘটে বাইরের প্রভাবে। তাকে এই সব ক্রিয়াকলাপের আপাত স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাবৃত্তি করে যেতে হয়, নিয়মহীন নিয়মিত বিরতিতে, এবং প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। অভিনেতা তার এসব ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করেন এবং তার এই চর্চায় উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করেন।

নাটকের মধ্যে যে উপাদানগুলি রয়েছে তা হল-

- মূল ভাবনা বা প্রেমিজঃ- একটা নাটকে তাঁর দর্শককে কিছু বলতে চায়। নাট্যকার একটা ধারণাকে অবলম্বন করে একটি কাহিনী তৈরি করেন। কাহিনীর মাধ্যমে তিনি তার ধারণাটিকে বলেন। তার এই মূল বক্তব্যটিই হল মূল ধারণা বা প্রেমিজ।
- কাহিনী বা প্লটঃ- নাটকে সাধারণত একটি ঘটনা থাকে। কাহিনী শুরু, মধ্য ও শেষ থাকে। এক বা একাধিক মানুষের বা চরিত্রের কাহিনী বর্নিত হতে থাকে। প্রধান কাহিনীর

পাশাপাশি নাটকে উপকাহিনী বা সাবপ্লট থাকতে পারে। তবে উপকাহিনী প্রধান কাহিনীতে সহায়তা করে।

- চরিত্রঃ- নাটকে যেই ব্যক্তিগুলির কাহিনী বর্ণনা করে সেই ব্যক্তিগুলোই নাটকের চরিত্র। মূলত একটি নাটকে একজন প্রধান চরিত্র হয়। চরিত্রটি নাটকের শুরুতে যে রকম থাকে, নাটকের শেষে সে রকম থাকে না। ঘটনা প্রবাহের প্রবাহে তার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে।
- সংলাপঃ- নাটকের চরিত্র বা পাত্রপাত্রী কথোপকথন আকারে যা বলে সেটাই সংলাপ। সোজা কথায়, নাটকের চরিত্রের মুখের কথাগুলোকেই সংলাপ বলে।

সমাজে অন্য সকল সুস্থ সবল মানুষের পাশে রয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষজন। আমাদের সমাজে এমন অনেক ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষ বাস করেন যারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবহেলিত। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে তারাও যে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম তা আমরা অনেকেই জানি না। এমনকি হয়তো তারা নিজেরাও জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাচিক প্রতিবন্ধী সুভা প্রসঙ্গে বলেছেন- 'যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না'- প্রতিবন্ধীদের সংকট এখানেই। তার একটি অঙ্গের বৈকল্য মানে যে সে পুরো বাতিল সমাজ থেকে তা নয়। তবুও আজও প্রতিবন্ধী মানুষ সমাজের মূলস্রোত থেকে নির্বাসিত। অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত এই মানুষেরা প্রাচীনকাল থেকেই পায়ের নিচে শক্ত মাটি পাবার সংগ্রামে লিপ্ত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন কর্মকান্ড, তাদের সমাজের সামনে তুলে ধরা দরকার। নাট্যকারেরা তাদের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা তুলেছেন। প্রতিবন্ধীদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থান, জীবনযুদ্ধে তাদের সংগ্রাম,বীরত্ব- সবই বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ভাবে নাট্যকারেরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছেন। নাটকে অভিনীত জীবনকথা ও দর্শকদের জীবনচেতনায় গ্রহন-

বর্জনের দ্বারাই তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যে জীবনকথা নাটকে ফুটে ওঠে তা কি সম্পূর্ন বাস্তব? না কি বাস্তবকে অতিক্রম করে বাস্তবের চেয়ে বেশি কিছু আমরা নাটকে দেখি! নাটকের মধ্যে সামাজিক জীবনের যে চিত্র তুলে ধরা হয় তাতে জীবনকে যথাযথ তুলে ধরা কি সম্ভব? জীবন তো শুধু ঘটনাস্রোত নয়। জীবন বলতে একটা যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা স্বপ্ন সাধনা সব। তাকে দু ঘন্টার অভিনয়ের সীমায় বাঁধা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ নাটকে যে ঘটনা তুলে ধরা হয়, তা জীবনের একটা অংশ মাত্র। সামাজিক জীবনে যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন তাদের জীবনধারা নানান পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিন্তু নাটকে যে সকল চরিত্র অভিনয় করেন, তাদের ক্ষেত্রে কেবল জীবনের একটি মাত্র পর্যায়-ই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে চুপকথার 'জন্মদিন' নাটকে হেলেন কেলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দোয়েল বসু। ১৯৯৭ সালের ১৯ আগস্ট প্রথম অভিনয় 'জন্মদিন' নাটকের। প্রায় ২৫০টি অভিনয় চলে এই নাটকের। শেষ অভিনয় হয় ৪ ডিসেম্বর ২০০১ সালে আকাদেমি মঞ্চে। ঘোষিত হল, এটাই জন্মদিনের শেষ অভিনয়। কেন? কারণ, নাটকে হেলেন কেলার বয়স না বাড়লেও বাস্তবে দোয়েল (হেলেন) বসু এই ক'বছরে বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠেছে। যেদিন দোয়েল প্রথম হেলেন কেলার হয়ে মঞ্চে আসে, সেদিন সে ছিল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। কিন্তু এখন (২০০১ সালে) সে ক্লাস টেন। চুপকথার পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন 'জন্মদিন'। উইলিয়াম গিবসনের লেখার বাংলা রূপান্তর ঘটেছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কলমে। জন্মদিন পর্বে যবনিকা টেনেছিলেন প্রয়াত অসিতবাবুর যোগ্য সহযোগী এবং চুপকথার বর্তমান নেত্রী ডলি বসু। তাঁর কথায়- 'জন্মদিন হল হেলেন কেলারের। দোয়েল বড় হয়েছে। তার পক্ষে আর যথার্থ হবে না এই নাটকের হেলেন কেলার হওয়া। ফলে যবনিকা। এর জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল ২৫০ তম অভিনয় সন্ধ্যাকে। হাজির বিশিষ্ট দর্শকরা। হাজির থিয়েটারের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। জন্মদিন নাটকের শেষে কথা বলতে শিখল

হেলেন কেলার অর্থাৎ কথা বললেন দোয়েল। বললেন, জন্মদিন নাটক শেষ হলেও, নাটকের সঙ্গে জড়িত থেকে যে শিক্ষা তিনি পেলেন, তা শেষ হওয়ার নয়। তিনি (দোয়েল) কথা বলতে শিখলেন। এটা নিছক কথা নয়। এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল হেলেন কেলার মেসেজ। তাঁর জীবনের বার্তা। যে বার্তা, যে বাণী আমাদের আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাঁর জীবন দিয়ে এই কথাটাই তো বলতে চেয়েছেন হেলেন কেলার- নিজেই নিজেকে অতিক্রম করতে হয়। এই স্পিরিট যদি এই নাটকের মাধ্যমে একটুও আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তাহলেই জন্মদিন সার্থক। তাহলেই বুঝতে পারব, জন্মদিন শেষ হয় না। বারবার ফিরে আসে।' (আজকাল পত্রিকা, ৫/১২/২০০১)

প্রতিবন্ধী স্বাভাবিকের সহোদর। শিশু অবস্থায় স্বাভাবিককে অন্যের নির্ভর হতে হয়। জীবন যাপনের অভ্যাস ও বৃত্তি শিখে নিতে হয়। এভাবে একসময় তার স্বাবলম্বন আসে। বড়রা বুঝে যান, এবার তার হাতপা তৈরি হয়েছে। সমস্যা হয় জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে। তার অন্য-নির্ভরতা কতদিনের ? শিশুত্ব কতদিনের ? সে স্বাবলম্বী হতে পারবে কি না। হলে, কতদিনে হবে ? কীভাবে হবে? তাঁকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে সেবা আর চিকিৎসার দরকার, তা তার কাছের স্বাভাবিক মানুষেরা দিতে পারবেন কি? প্রতিবন্ধী মাত্রেই যে জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী, তা কিন্তু নয়। স্বাভাবিকের মধ্যেও প্রতিবন্ধী লুকিয়ে থাকে। স্বাভাবিক শিশুও পরে প্রতিবন্ধী হয়। এই মুহূর্তের স্বাভাবিক মানুষ পরমুহূর্তে অস্বাভাবিক হয়ে যান। দুর্ঘটনার কারণে আমাদের অনেককে প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে হয়। আরও অনেক কারণে হতে হয়। এইসব উদাহরণ এই বোধে নিয়ে যেতে চায় যে, প্রতিবন্ধী যে স্বাভাবিকের সহদর এ-সত্যও আংশিক, পূর্ণ সত্য এই যে, একই মানুষ স্বাভাবিক আর প্রতিবন্ধী। আমাদের স্বাভাবিকতা তো পরিবেশ আর ব্যবস্থার নির্দিষ্টতা নির্ভর। নির্দিষ্টের হেরফেরে আমাদের অভিব্যক্তি ও আচরণে কি সবসময় স্বাভাবিক হয়? আবার, ভেতরের বা বাইরের ধাক্কায় আমাদের নির্দিষ্ট পরিবেশ আর

ব্যবস্থায়ও তো আমরা মানসিক বা শারীরিকভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়তে পারি। কারণ, দেখছি তো হই-হই করা মানুষও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন, মাঠের দুরন্ত খেলোয়াড় ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছেন,রং আর রেখার শিল্পী অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধী স্বাভাবিকের সহোদর হোক, পূর্ণ সত্যে, সে স্বাভাবিকেরই উলটো দিক হোক, স্বাভাবিকের সঙ্গে প্রতিবন্ধীর সম্পর্ক কিন্তু সংঘাতের। স্বাভাবিক নয় বলেই একজন প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীর আচরণ স্বাভাবিকের নিয়ম কানুনের অনুগামী হয় না। তার স্বেচ্ছাচার ব্যতিক্রমী হয়ে চলে। স্বাভাবিকের পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই, আমাদের ঘরে প্রতিবন্ধীকে নিয়ে আমরা লজ্জায় পড়ে যাই। আমাদের সামাজিক মেলামেশা মার খায়। আমাদের বিস্তার থেমে যায়। ঘারে এসে পড়া প্রতিবন্ধীকে কীভাবে স্বাবলম্বন দেব, কীভাবে তাঁকে সামাজিক জীবনে উপযুক্ত করে তুলব, তার উপায় হাতড়ে বেড়াই। চেনা, অচেনা- যে কোনও মানুষ তখন যে-সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাকে জীবনের সব থেকে বড় পাওয়া বলে মনে হয়, সেইসব মানুষের প্রতি জীবনভর কৃতজ্ঞতার বোধে আনত থাকি। মানুষের বিপদে পাশে এসে দাঁড়ানো মানুষ, আর্তের সেবায় এগিয়ে আসার মানুষ, প্রতিবন্ধীকে স্বাবলম্বনদানের ব্রতীও তো কম নেই আমাদের মধ্যে। প্রত্যাখ্যান চোখেই পড়ে না প্রায়। বিশেষ করে আমাদের তরুন- তরুণীরা তো নিজেদের উজার করে দিতে চান দেখতে পাই। এসব সত্য মেনে নিয়েও দেখি, প্রতিবন্ধীর যে সেবা, পরিচর্যা, শিক্ষা আর বন্ধুত্ব পাওয়ার কথা, আমাদের স্বাভাবিকের সমাজ তাঁকে তা দেয় না। এ-ব্যাপারে আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা আর অশিক্ষা সমান দায়ী। দায়ী স্বার্থমগ্ন জনের বৃহৎ জগৎ বিষয়ে বিমুখতা। এখানে, আমাদের অগ্রগতির অমানবিকতা প্রকট হয়, আমাদের আধুনিকতার অমানবিকতা প্রকট হয়। কিন্তু, ভরসা পাই, যখন দেখি আমাদের নবীন প্রজন্ম প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। তারা তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছেন, তাঁদের খেলাধুলো গান-বাজনা-অভিনয়-ছবি আঁকা প্রভৃতিকে ভেড়াচ্ছেন, এমনকী, তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে

চড়তে মদত দিচ্ছেন। অনেক তরুন- তরুনী এ কাজ আরও ভালো করে করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এ কাজে উদাসীনতা- নিষ্ক্রিয়তা – দুষ্টুমি- সংঘাত প্রভৃতির যেমন জটিল সমস্যা দেখা দেয়, তাঁদের সমাধান খুঁজতে গবেষণাকর্মে নিবিষ্ট হচ্ছেন।

ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে সংসার। একা হয়ে যাচ্ছে মানুষ। টেলিভিশনের একশো চ্যানেল আর কম্পিউটারের ইন্টারনেট সঙ্গী হয়ে উঠছে আধুনিক মানুষেরা। ইন্টারনেটের একটা জুৎসই বাংলা আছে- 'অন্তর্জাল'। অন্তর্জালে পৃথিবীটা খুব কাছে চলে আসছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে মানুষের যোগ কমে যাচ্ছে ক্রমশ। বেড়ে যাচ্ছে দূরত্ব। আর, বয়স্ক মানুষদের এইসব আধুনিক খেলনাপাতির জন্যে অনেক বেশি একা হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট পরিবারের ফ্ল্যাটবন্দী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। একাকীত্ব তাঁদের জীবনকে দুর্বহ করে তুলছে অনেক সময়। মানসিক ভাবে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাঁদের বাবা,মা,অভিভাবক, সমাজের বড়রা, আমরা অনেক সময় তা টেরও পাই না। যখন বুঝতে পারি, তখন হয়ত অনেক দেরি হয়ে যায়। আর দেরি করতে রাজি নন ডলি বসু। অসিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'চুপকথা' নাট্যদলের হাল ধরেছেন তিনি। বহুদিন অভিনয় করেছেন, করিয়েছেন 'জন্মদিনের' মতো অসাধারণ নাটক। জন্মদিন-এ হেলেন কেলারের মতো এক 'অ-স্বাভাবিক' শিশুর অ- সাধারণত্ব নির্মিত হয়েছে মমতার সঙ্গে। হয়ত তখন থেকেই ডলির মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জন্ম নিয়েছিল, শুধু নাটকে নয়, চারপাশের জীবনে, সংসারে যেমন শিশু একা হয়ে আছে, একা হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এতদিনে, সত্যি-সত্যিই তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। যেমন ছোট ছেলেমেয়ে পরিস্থিতির চাপে, পরিবেশের প্রভাবে, অথবা কিঞ্চিৎ শারীরিক বা মানসিক দূর্বলতার কারণে মূলস্রোত থেকে কিছুটা দূরে, অথবা বিষণ্ণ, অথবা কিছুটা একা, তাঁদের সঙ্গী করে নিয়েছেন ডলি।এবং তাঁদের জীবন থেকে একাকীত্ব দূর করে, তাদের উদ্দীপ্ত করতে ডলি বসু আশ্রয় নিয়েছেন নাটকেই। এইসব ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি করেছেন শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক-

মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ। দু'তিন মাস 'চুপকথা'র মহলাকক্ষ এইসব ছেলেমেয়েদের মহড়াতেই জমজমাট। পরে এইসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিনীত হয়েছিল 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। ২৬ জন শিশু, কিশোর, কিশোরী শিল্পী এতে অভিনয় করেছেন। সঙ্গে থাকছেন দুই শিশুর দুই অভিভাবকও। চুপকথার সদস্যরাও এই কাজ নিয়ে মেতে ছিলেন। চুপকথার জন্মদিনের এমন একটা ঘটনা উদ্দীপ্ত করবে বাংলা নাটকের দর্শকেও। তাদেরও ভাবাবে, চারপাশের একা একা ছোটরা আসলে একা নয়, তাঁরাও পাশেই ছিলেন। ডলি বসু এটাকে বলেছেন, থিয়েটার থেরাপি। কয়েক বছর ধরে কাউন্সেলিংয়ের পাঠ নিয়েছেন তিনি। এবং বেছে নিয়েছেন থিয়েটারের পথ,যা ছোটদের যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখমুখি হতে শেখাবে। শারীরিক, মানসিক নানা প্রতিবন্ধকতা তাদের শিশুকে একলা করে দেয়। এছাড়া আছে পরিবারের চাপ, সমাজের ভ্রূকুটি। বহু বাবা-মা, অভিভাবক শুধু টাকা রোজগারে ব্যস্ত। ছেলেমেয়ের দিকে তাকানোর সময় নেই। যখন সময় দিতে বাধ্য হন, তখন যে দেরি হয়ে যায়। এই দেরিটা যাতে না হয়, তারই উদ্যোগে এই থিয়েটারের প্রচেষ্টা, এই মার্চেন্ট অফ ভেনিস- জানালেন ডল। কিন্তু 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' কেন ? আসলে, আমাদের চারিপাশে উদারতার মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকে। আমরা অনেকেই সেই মুখোশ পরা মানুষ। 'মার্চ্রন্ট অফ ভেনিস'- এর শিক্ষা এটাই যে, উদারতার মখোশ পোরো না, সত্যিকার অর্থে উদার হও। ধর্ম , জাত, বর্ণ ভেদাভেদ মানুষকে ছোট করে দেয়। নাটক করতে করতে এই সব ছোটরা যেমন পরস্পরের কাছে আসছে, তেমনি আবিষ্কার করছে নিজেদের কুশলতা, দক্ষতা। থিয়েটার তো মানুষকে কাছে আনে। বেড়া ভাঙতে শেখায়। ডলির বিশ্বাস- সেজন্যেই থিয়েটার থেরাপি খুব দরকার আজকের ছোটদের জন্যে। তাহলে অভিনেত্রী, নাট্যপরিচালক ডলি বসু কি ডাক্তার ডলি বসু হয়ে উঠেছেন ? প্রাণখোলা হাসি নিয়েই প্রতিবাদ করে ওঠেন ডলি বসু। বলেন, মোটেই ডাক্তার নই, বন্ধু। একদম ঠিক। 'বন্ধু' শব্দটাই ডলি বসুর নামের

পাশে আজ অনায়াসে বসানো যায়। তাঁর বন্ধুদের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' যারা দেখেছেন তাঁরাও এইসব ছোটদের বন্ধু হয়ে উঠবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নাটকের সীমানার মধ্যেই কেবল প্রতিবন্ধীরা আবদ্ধ নয়, প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যে পৌরাণিক আখ্যানে প্রতিবন্ধী মানুষেরা চিত্রিত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থান দেখি। পরবর্তীকালের আখ্যানে, কাব্যেও আমরা এদের দেখা পাই। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র ঃ মহাভারতের অন্যতম প্রতিবন্ধী চরিত্র। জন্মান্ধ রাজা। বিচিত্র বীর্যের অকাল প্রযাণে বংশলোপের ভয়ে মাতা সত্যবতী নিযোগ প্রথার মাধ্যমে অম্ব অম্বালিকা অম্বিকাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের সচেষ্ট হন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস একার্যে নিযুক্ত হন। সঙ্গমকালে দীপ্ত চক্ষু পিঙ্গলজটা দেখে অম্বিকা ভীতা হয়ে চক্ষু মুদিত করেন। ফলশ্রুতি জন্মান্ধ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র।

অন্ধমুনির কথা ঃ আসলে এই মুনির নাম অন্ধক। ইনি এবং এঁর পত্নী দু'জনেই অন্ধ ছিলেন। অন্ধক ছিলেন বৈশ্য এবং স্ত্রী ছিলেন শুদ্র কন্যা। সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে বাস করতেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র সিন্ধু যখন কলসীতে জল ভরছিল তখন জল পূর্ণ হবার শব্দকে হরিণের জলপান ভেবে রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে সিন্ধুকে বধ করেন। পুত্রশোকে অন্ধমুনি দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যু হবে অভিশাপ দিয়ে জ্বলন্ত চিতায় সস্ত্রীক প্রাণ বিসর্জন দেন।

অর্ধনারীশ্বর ঃ শিব দুর্গার একক মূর্তি। একদিকে পুরুষ অন্যদিকে নারী। ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, চার ভুজে পাশ, রক্ত পদ্ম নরকপাল এবং শূল। এই পত্নপ্রতিমা বাস্তবের না নারী-না-নর চেতনাকে বাস্তবের মাটি দিয়েছে।

বৃহন্নলা ঃ না-নর না-নারী চরিত্র বৃহন্নলা। মহাভারতের উল্লেখ্য চরিত্র অর্জুনের সাময়িক ক্লীবত্বের রূপ বৃহন্নলা, প্রতিবন্ধী হিসেবে উল্লেখ্য, তার প্রতিবন্ধকতা যৌনগত (Sexual). স্বর্গবাসকালে অর্জুন উর্বশিকে প্রত্যাখান করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে এই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটনগরে রাজনন্দিনী উত্তরার নৃত্যগীতের শিক্ষক হন বৃহন্নলা। উত্তরার কছে তাঁর নারী-ধর্মের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য এবং গোহরণ কালে রাজপুত্রের সারথি হয়ে গো-ধন উদ্ধারেরসময় তার পুরুষ ধ্বরমের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। 'বৃহন্নলা' যৌন প্রতিবন্ধী, পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে অবিস্মরণীয়।

অষ্টাবক্র ঃ উদ্দালকের শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতা বা সুমতির বিবাহ দেন। গর্ভবতী সুজাতার গর্ভস্থ সন্তান শ্রুতি-মাধ্যমে সর্ববেদজ্ঞ হন। পিতা কহোড় একদিন বেদ পাঠকালে গর্ভস্থ শিশুমুখে শুনলেন তার বেদপাঠ নাকি অশুদ্ধ। ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা কহোড় অভিশাপ দিলেন, ভূমিষ্ট হবার আগেই যখন তার স্বভাব এত বক্র, তখন ভূমিষ্ট হবার পর দেহের অষ্টস্থান বক্র হবে। যথাকালে এক বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হল- তার নাম অষ্টাবক্র। পরে পিতার কথার মতো এক নদীতে স্নান করে সমঙ্গ হন- সুন্দর স্বাভাবিক অঙ্গ ফিরে আসে। তাই নদীর নাম সমঙ্গা। এই মুনির উপদেশাবলী 'অষ্টাবক্র সংহিতা' নামে খ্যাত।

কুব্জা ঃ মথুরা রাজবংশের পরিচারিকা। কৃষ্ণের সঙ্গে এই পরিচারিকার সাক্ষাৎ হয় কংসের ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে। এই পরিচারিকা কুরূপা এবং কুব্জা অর্থাৎ দেহগত প্রতিবন্ধী। কৃষ্ণের কৃপায় এই রমণী স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরে পান।

কৃষ্ণ কথার 'আয়ান' বা আইহন ঃ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আইহন প্রসঙ্গ পাই। 'পৌরাণিক অভিধান' অনুসারে ইনি পূর্বে ঋষি ছিলেন। নারায়ণের কাছে তিনি বর চাইলেন যে, নারায়ণ-পত্নী যেন তাঁর পত্নী হন। নারায়ণ জানালেন পরজন্মে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে আয়ান

লক্ষ্মীকে স্ত্রী রূপে পাবেন। তবে আয়ান জন্মাবেন নপুংসক হয়ে। লক্ষ্মী জন্মালেন রাধা হয়ে, ক্লীব আয়ান ঘোষের স্ত্রী হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রেম সর্বজনবিদিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথমে কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল- "ঘরের সামী মোর...." কিন্তু বাস্তবিক যৌন প্রতিবন্ধী আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধাকে পরবর্তীতে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হতে দেখি। 'দেহগত কামনা বাসনার অতৃপ্তি থেকে পরবর্তীতে কৃষ্ণ সান্নিধ্যে তৃপ্তির স্তরগুলি বড়ু চণ্ডীদাস খুব সচেতনভাবে দেখিয়েছেন।

'সতীময়না' কাব্যের 'বামন' ঃ সপ্তদশ শতকের আরাকান সাহিত্য শাখার অন্যতম কবি দৌলত কাজীর কাব্য 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের এক যৌন প্রতিবন্ধী চরিত্র বামন। গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রাণীর বিবাহ হয়েছিল নপুংসক বামনের সঙ্গে। চন্দ্রাণীর জীবনে সুখ ছিল না। চন্দ্রাণীর প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ লোরক চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হলে দু'জনার প্রতি অনুরক্ত হন এবং পরে পালিয়ে যান। পথে বামনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় লোরকের হাতে বামন নিহত হন। একদিকে প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে চন্দ্রাণী বঞ্চিতা অন্যদিকে লোরকের সঙ্গে মিলনে তার তৃপ্তির ছবি। রক্তমাংসের মানব চরিত্রের দাবী এই কাব্যে প্রতিফলিত হতে দেখি। 'বামন' অল্প পরিসরে হলেও সুচিত্রির। নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করতে তার যুদ্ধের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সেও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জড়ভরত ঃ পুরকালের রাজা ভারত বাণপ্রস্থকালে হরিণ শিশুর চিন্তা করতে করতে মৃত্যু বরণ করেন। পরে জাতিস্মর মৃগ জন্ম। পরজন্মে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মান। পরে তার মোক্ষ লাভ হয়। জড়ভরত আসলে মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষেরই পুরাণ প্রতিমা।

পৌরাণিক এই সব প্রতিবন্ধী মানুষেরা নানা আখ্যানে কাব্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আমরা দেখেছি দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার করণে এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে উপহসিত হয়েছে,

শোষিত হয়েছে। এই সব পৌরাণিক চরিত্ররা বর্তমান কালের বাস্তবজীবন-ভিত্তিক, প্রতিবন্ধীকেন্দ্রিক সাহিত্যের নানা চরিত্রের পূর্বসুরী। রূপ বা সময়ের বদল ঘটেছে মাত্র; অবস্থানটি রয়ে গেছে পূর্ববৎ। শোষণ আর বঞ্চনার রকমফের আছে মাত্র, কিন্তু সমাজ ও দেশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষেরা আজও উপহাসিত হয়ে চলেছে, বঞ্চিত হয়ে চলেছে।

বাস্তব জীবনের যে নানান ঘটনা নাটকে তুলে ধরা হয় তাতে থাকে নায়ক,নায়িকা এবং আরও নানা চরিত্র। কিন্তু সামাজিক জীবন সংগ্রামে তেমন কোনো নায়ক- নায়িকা থাকে না, তা মূলত রূঢ় বাস্তবকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ নাটকের মধ্যে যেসকল ঘটনা ধারাকে আবদ্ধ করে নাট্যকার নাটক গড়ে তোলেন তাতে তিনি কল্পনার জালে বাস্তব ঘটনাকেই বাস্তব অতিরিক্ত করে তোলেন। যা সাধারণ দর্শকের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যার ফলে নাটোকের প্রতি দর্শকদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। নাটকের মধ্যে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ এবং সবল। অভিনয়ের ক্ষেত্র হিসেবে তাদের উক্ত স্থানগুলি যথাযথ অঙ্গভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রতবন্ধীর ভান করে থাকেন। পাশাপাশি নাটকের অভিনয় ক্ষেত্র বা মঞ্চ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের অভিনয় সম্পূর্ন করতে হয়। কিন্তু সামাজিক জীবনে মানুষের জীবনযাত্রা কোনও গণ্ডির মধ্যে কখনোই আবদ্ধ হতে পারে না। বাস্তবে যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন তারা নানা বাঁধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম করে চলেন এবং এই কঠোর জীবন সংগ্রামে তাদের জয় নিশ্চিত।

নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যা নাটকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নাটক যেহেতু মানুষের জীবনের কথা বলে এবং মানুষ মাত্রই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু বৃহত্তর অর্থে যে কোনো

নাটক-ই সামাজিক নাটক। কিন্তু সামাজিক নাটক অভিধায় যখন কোনো বিশেষ শ্রেনিকে চিহ্নিত করা হয় তখন সেই শ্রেনি বিশেষ চরিত্র লক্ষণ দাবী করে। সামাজিক নাটক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি যুগ বা সময়ের সামাজিক সমস্যা বা সংকট নিয়ে লেখা নাটক। সমাজের অন্তর্গত শক্তি সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও এ জাতীয় নাটকের উপজীব্য। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি চরিত্রের সমস্যাও সামাজিক নাটকে থাকতে পারে। বাংলা যে সকল নাটকগুলিতে প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে সেখানেও এরকম নানান সমস্যার কথা ফুটে উঠেছে। নাটকের মধ্যে প্রতিবন্ধীরা সমাজ এমনকি পরিবারের কাছ থেকে নানান লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকগুলি যত এগিয়ে চলেছে নাট্যকার প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিকে নিজ মর্যাদার আসনে ফেরাতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রতিবন্ধীরা যে সমাজের ফেলনার পাত্র নয়, তারাও অন্য পাঁচজন সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির মতোই সমাজ ও পরিবারে সমমর্যাদার অধিকারী। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজ গুণ ও মনোবলে অসম্ভব কাজও সম্ভব করে তুলেছেন। নাট্যকারদের এই সকল নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে পাঠক ও দর্শক সমাজকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করেছেন। সমাজ উন্নত হচ্ছে ক্রমশ, শিক্ষা- প্রযুক্তি- বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার ঘটছে। গ্রাম থেকে শহরে প্রতনিয়ত নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ কর্মকান্ড চলেছে- তবু আজও সমাজের কোণে কোণে চেপে বসে আছে নানা অশিক্ষা- অসচেতনতা ও কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর। আগে যখন কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে পালস্ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচী চলার সময় শিশুদের ঐ টিকা দেবেনা বলে গ্রামের লোক বেঁকে বসতো- তাদের বক্তব্য তারা মাতববরদের কাছে জেনেছে ঐ টিকা খাওয়ালে নাকি শিশুর সর্বনাশ হবে- যৌনক্ষমতা কমে যাবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা নানা ভাবে বোঝাবার উপর সমাধান হয়। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি পিতা-মাতার সচেতনতার অভাবে শিশুর প্রতিবন্ধকতা বা বিকলাঙ্গতার কারণ। এর জন্য দরকার সুস্থ শিক্ষা ও সচেতনতা। বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের নিয়েও নানান সিনেমা তৈরি করা

হচ্ছে। নাটকের মতোই সিনেমা তথা চলচ্চিত্র একটি প্রকাশ মাধ্যম। সেখনে থাকে উন্নত টেকনোলজি ক্যামেরা-আলো-শব্দ-সংলাপ, দৃশ্য সংস্থাপন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। তার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক রূপ- নতুন ভাষা। সিনেমার মাধ্যমেও জীবন ও জগতের বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যের উপাদান নিয়ে যেমন সিনেমা হয়- তেমনি সিনেমার প্রযোজনে লেখা হয় চিত্রনাট্য। সমাজের নানা ঘটনা সমাজনৈতিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক- তা উঠে এসেছে সিনেমায়। প্রথম যুগের ভারতীয় ঐতিহ্য পুরাণকথা-নির্ভর সিনেমার (যেমন 'হরিশচন্দ্র' বা 'বিদ্যাপতি') পথ ধরে এসেছে স্বাধীনতাকামী ছবি, বাস্তব-জীবন কেন্দ্রিক সিনেমা। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি', গৌতম ঘোষের 'পার' বা মৃণাল সেনের 'তাহাদের কথা'- এক সমৃদ্ধশালী পরম্পরার পথ। সমাজের মুখচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে ভারতীয় সিনেমায়- কি বাংলা কি হিন্দী বা মালয়ালাম সিনেমায় ননারীর প্রতিবন্ধকতার কথা উঠে এসেছে। তা কোথাও বর্ণনাধর্মী কাহিনিনির্ভর, কোথাও কোথাও গবেষণাধর্মী ফিচার বা ডকুমেন্টারিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

সাহিত্যের নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী থাকে- সিনেমার থাকে আপামর দর্শক সমাজ। সাহিত্যের থেকে একটি চলচ্চিত্র তার বক্তব্যকে অতি সহজেই মানুষের কাছে পৌছাতে পারে। অপুর কাহিনি যারা পড়েনি,'পথের পাঁচালি' সিনেমা অতি সহজেই তাদের কাছে পৌছে গেছে। মিল-তত্ত্ব-কেন্দ্রিক জনতাজনার্দনমুখী যে কোনো চলচ্চিত্রে দর্শক একটি বড় ভূমিকা পালন করে। সমাজের কাহিনি নির্মিত হয়ে আবার সমাজের কাছে ফিরে এসে সমর্থন অনুমোদনের প্রত্যাশা করে। মানুষ দেখে মানুষেরই মুখ। সিনেমা তুলে ধরে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু সিনেমা তৈরি হয়েছে কিন্তু তবুও সিনেমা ও নাটকের মধ্যে একটা বিশাল ফারাক লক্ষ্য করা যায়। কারণ সিনেমাতে আমরা যে

দেখি তা মূলত পর্দার আড়াল থেকে কিন্তু থিয়েটার সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়। জীবন্ত দর্শক আসছে জীবন্ত অভিনেতাদের সামনে। সিনেমা কিন্তু তা নয়। এখানেই থিয়েটারের জোর প্রকাশিত হয়।

নাটকের মধ্যে যেসকল প্রতিবন্ধী চরিত্র অভিনয় করেন তাঁরা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা বিষ্যটিকে তুলে ধরেন কিন্তু বাস্তব জীবন কোনো অভিনয় নয়। সেখানে সমস্তটাই সত্য এবং বর্তমান। বাস্তবের-ই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে যদি নাটক করা যায় তা হলে থিয়েটারে অভিনীত নাটক এবং চরিত্রটি আরও পূর্ণ ও যথাযথ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি চরিত্রের ভাবনা, আবেগ এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঠিক ভাবে প্রকাশ পাবে। এই রকম কয়েকটি নাটকে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ দেখা যেতে পারে-

এঁরা সকলেই দৃষ্টিহীন। কেউ একেবারেই দেখতে পান না। কেউ আবছা দেখেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী বলে দূরে সরিয়ে রাখার উপায় নেই। ব্লাইন্ড অপেরার অভিনেতা-অভিনেত্রী এঁরা। তাঁদের নাটক অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। বিজন থিয়েটারের দরজায় পৌছতেই তা বোঝা গিয়েছিল। ড্রামের বজ্রনির্ঘোষ। মঞ্চমধ্যে নচিকেতা তাড়া করে ফিরছে মৃত্যুর অধীশ্বর যমকে। প্রাণের ভয় নয় শাশ্বত প্রশ্নের গুঁতো। কারণ এই যমই জানেন মৃত্যুর রহস্য। যেমন ভাবে শক্তিধর দালালেরা জানে শক্তি উৎস। মঞ্চে নিখুঁত দৌড়। কে বলবে নচিকেতা বা যম দু'জনেই দৃষ্টিহীন। আর এ ভাবেই চোখ খুলে দেয় ব্লাইন্ড অপেরা। এ ভাবেই আলোর পৃথিবীর মানুষদের বিনোদনের জন্য ব্লাইন্ড অপেরার নিবেদনে 'নচিকেতা' অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে। ব্লাইন্ড অপেরা ভারতে একমাত্র এবং বিশ্বে পঞ্চম নাট্য দল। দাবি এই আকাদেমির পরিচালক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের। অন্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তৈরি এই ব্লাইন্ড অপেরা আজ আর কোন অ্যামেচার নাট্যদল নয়। দলটির জন্ম ১৯৯৬ সালে। তখন থেকেই একের পর এক প্রযোজনা ব্লাইন্ড অপেরার জাত চিনিয়েছে। আর্বিভাবে 'অর্কেস্ট্রা' নাটকটি করে রীতিমত তাক

লাগিয়ে দেয় ব্লাইন্ড অপেরার কুশীলবেরা। তারপর ‘সংক্রান্তি’, ‘অন্ধকারের রূপকথা’, ‘মনসামঙ্গল’, ‘চৈতন্যের মৃত্যু’, ‘নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর’, ‘রাজা’ থেকে আতরবালার সীমান্ত গাথা’। নামেই মালুম প্রতিটি নাটক অত্যন্ত সিরিয়াস। এমনকী নতুন এই নাটক ‘নচিকেতা’ কিন্তু নিছক কঠ উপনিষদের হুবাহু নাট্যরূপ নয়। রয়েছে বাস্তব ঘটনার বিন্যাসের এক ঋদ্ধ সমন্বয়। মৃত্যুর পরে মানুষ কী করে বাঁচে? জানে বালক নচিকেতা।আর দৃষ্টিহীন হলে? এটা শুধু নাটক নয়। বেঁচে থাকার আকরও। “চিকিৎসায় যেমন হরেক কিসিমের প্রয়োগ রয়েছে। এটা উনাদের ড্রামা থিরাপি। এ থিরাপি সঙ্গ বদ্ধ ভাবে বাঁচার থিরাপি। মহড়ায়, সমবেত গানে, এই নাটকে কুশীলবদের নিরন্তর মেলা মেশাই যে এই দৃষ্টিহীনদের বেঁচে থাকার কারণ।” জানালেন শুভাশিস। এই কুশীলবের কেউ জন্মান্ধ , কারও চোখ থেকে পৃথিবীর আলো ক্রমশ নিভে আসছে। কেউ দুর্ঘটনায় হারিয়েছে চোখ তো কারও চোখ ভুল চিকিৎসার ফসল। অন্ধকারের বিশ্বে এখানেই চলে আলোর সন্ধান। শামিম, সুতপা, মর্জিনা, কমল,ঝর্না, সুভাষ, নাজমারা হৃদয় দিয়ে গড়ে তুলেছেন ব্লাইন্ড অপেরা। নাটকের নেপথ্যে গড়ে উঠেছে হৃদয় দেওয়া নেওয়ার বাস্তব নাটকটিও। দৃষ্টিহীন এই অপেরার অভিনেত্রী মর্জিনাকে বিয়ে করেছেন লাইটম্যান সুমিত চক্রবর্তী। এমন করেই ঘর বেঁধেছেন এই অপেরার ঝর্ণা অধিকারী এবং শামিম আখতারও। অপেরায় ভেঙে গিয়েছে জাতধর্মের কুৎসিত বেড়াজাল। প্রায় ত্রিশজন কুশিলবের এই দলে ক’জন কী ভাবে সুযোগ পায় অভিনয়ের? ‘না, এমন বাছ- বাছায়ের বিলাসিতা আমাদের নেই। এমনিতেই আমরা বাতিল। নাটকে বসিয়ে রাখা তাই আমাদের কুশীলবদের কাছে বিলাসিতা। আর এটা গ্রুপ থিয়েটারে অন্যত্র চলে। এখানে নয় কারণ এটা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে’। ‘ ইন সার্চ অব চাইল্ড থিয়েটার’ নান্দীকার চলিত দলটি ফুটপাতের শিশুদের নিয়ে একটা নাটক তৈরি করে ‘হল্লা’ নামের একটি নাটক। নাটকটি রীতি মতো সাড়া জাগায় দর্শকদের চোখে। তারপর চারটি তরুণ শুভাশিস, দেবাশিস,প্রশান্ত ও অলোক নন্দিকার ছেড়ে এসে শুরু করে বিচিত্র এক

খোঁজের। ‘যারা দেখতে পান না, তারা কি দেখেন? সেই খোঁজেই শুরু এই অপেরা। দৃষ্টিহীনতা অভিনয়ের জগতে কোনও বাধাই নয় এটা দেখিয়ে গিয়েছিলেন বাংলা নাট্য ও ফিল্ম জগতের কিংবদন্তী কৃষ্ণচন্দ্র দে। গানে- অভিনয়ে সবেতেই তিনি ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে পা রেখেছে সুভাষ দে। ব্লাইন্ড অপেরার সহ-সভাপতিও। বললেন ‘আমাদের পৃথিবীটা শোনা আর ছোওয়ার ওপর নির্ভর করে’। এই নাটকে তাঁকে দেখা যাবে যমের ভূমিকায়। এই অপেরার অনেক ছেলেমেয়ের নাটকই অন্ন জোগায়। তবে সুতপা সামন্ত শাড়ির ব্লক তৈরি করেন। এম এ–র প্রথমবর্ষ অবধি পড়েছেন সুতপা। গৌতম ঘোষের ‘দেখা’ ছায়াছবির গগনকুমারকে মনে পড়ে? এই গগন আসলে এই অপেরারই এক আবিষ্কার নাম কমল কাঞ্জিলাল। ছ’ফুট উচ্চতার কমলকে দেখে মনে হবে যেন ফিল্মে বর্নিত গ্রিক পুরুষ। চোখে জ্যোতি ফুরিয়ে আসা দুরারোগ্য রোগের শিকার এই কমল কিন্তু। বললেন “কেন বলুন তো আমাদের ভেবে বাংলা নাটকে বা ছবিতে স্ক্রিপ্ট লেখা হয় না”। আসলে অন্ধদের নিয়ে অন্ধত্ব এখনও এখনও কাটেনি চোখ থাকা মানুষের। দেখা যাক এটা কাটতে আরও কতদিন লাগে।

ওঁরা নিজেরা নিজেদের থিয়েটারের দল গঠন করেছেন। ‘১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ওঁদের প্রযোজনা সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। ওঁরা এই দলের প্রায় তিরিশ জন। ওঁদের দলের নাম ব্লাইন্ড অপেরা। আর ওঁরা নিজেরা নিজেদের ওড়ার আকাশ তৈরি করেছেন। ওঁদের লক্ষ্য এখন দৃষ্টিহীনদের শরীর ও মন বিকাশে সহায়তা আর তাঁদের সংস্কৃতির নিজস্ব ভাষা নির্মাণ, থিয়েটারের মাধ্যমে। হ্যাঁ, সুভাষ দে, মর্জিনা খাতুন বা সুতপা সামন্তরা জেদ আর সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সুভাষের বয়স যখন দু’ বছর, তখন চোখের পাশের ফোঁড়া কাটতে গিয়ে চোখের শিরা কেটে ফেলেছিলেন। তার পর থেকে তাঁর দু চোখে কোন আলো নেই। শৈশবেই হারান মা-বাবাকেও। তারপর ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল।

দিনরাত্রি লেখাপড়া, খেলাধুলো। গানবাজনা, লেখালেখি সব বিষয়ে স্কুলের সেরা ছাত্রদের মধ্যে নজর কেড়ে নেয়। গ্র্যাজুয়েশন স্কটিশ চার্চ কলেজে। এই সময়ে সুভাষ দৃষ্টিহীন্দের অধিকার বিষয়ে রাজনীতি আর থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কলেজ শেষ হতে না হতেই পরবর্তী ঠিকানা হয় থিয়েটারের মহলাকক্ষ। হয়ে ওঠেন থিয়েটারের সর্বক্ষণের কর্মী। অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার সুভাষ সুরকার, গীতিকার হিসাবেও পরিচিত। থিয়েটারের মাধ্যমে দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের শরীর-মনের বিকাশ ঘটানোর এই কাজে তিনি এক দক্ষ প্রশিক্ষকও বটে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে শ্যামল সেন স্মৃতি পরস্কার পেয়েছেন। কলকাতা-মফস্সল কিংবা দিল্লি বা অসম সব জায়গায় অভিনয় বা প্রশিক্ষনের জন্য পেয়েছিলেন বহু সম্মান। এই দেশে তিনিই প্রথম দৃষ্টিহীন পরিচালক-নাট্যকার যিনি আরও দৃষ্টিহীনদের নিয়ে সৃষ্টিকরেছেন ‘অলীক দৃষ্টি’র মতো প্রযোজনা। সুভাষের প্রিয় শখ পাহাড় চড়া, জঙ্গলে ঘোরা, দুর্গমে ভ্রমন। এখনও বাকি অনেক কাজ, হাল ছাড়ার পাত্র নন তিনি।’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫)

মর্জিনা খাতুনও ঠিক তেমনই। ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হদ্দ গাঁয়ের মুসলিম পরিবারের বেড়াজালের ভেতর সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এই অভিনেত্রীর জন্ম। মর্জিনা শৈশবে ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলে আশ্রয় পান। দৃষ্টিহীন যখন গলগ্রহ হয়ে যায়, বাড়ির লোকেরা ওদেরকে পৌছে দিয়ে আসে সেই সব আশ্রয়ে। শুধু শিক্ষার কারণে বা অভাবের কারণে নয়। দায় এড়াবার কারনেও। মর্জিনা খাতুন স্বাধীনতার লড়াই লড়তে থাকেন দুই স্তরে। এক, তিনি মুসলিম নারী বলে। দুই, তিনি দৃষ্টিহীন বলে। ছোটবেলা থেকেই মর্জিনা খাতুন এই সব কারণেই সয়েছেন ঘরে বাইরে বহু অপমান। তবুও হাল ছাড়েননি। মর্জিনার সম্পদ গান। স্কুল থেকে স্কটিশ চার্চ, স্কটিশ থকে রবীন্দ্রভারতীর ‘গান’ বিভাগে পৌছে যান মনের জোর আর সাহসের পাখায় ভর করে।

কলকাতায় লেডিজ হোস্টেলে নিজের খরচ চালিয়ে পড়েছেন, গানের সঙ্গে চালিয়ে গেছেন থিয়েটার। লোকে কুমন্ত্রণা দিয়েছেন, হাসাহাসি করেছেন। মর্জিনা শুধু নিজের লক্ষ্যেই নিজের প্রাণের গানকে সম্বল করেই এগিয়েছেন। থিয়েটারেও তাই মার্জিনাকে বাদ দিয়ে আবহের কথা ভাবতে পারেন না কেউই। মনসামঙ্গল নাটকে সনকার চরিত্রে মার্জিনা অনবদ্য, রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে মার্জিনার গান শুনতেই লোকে আসে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন, বিষয়ঃ ‘গানের মধ্য দিয়ে থিয়েটারের সাহায্যে দৃষ্টিহীন নারীদের সারিয়ে তোলা।’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫)

সুতপা সামন্তর লড়াইটাও একই পথে। আংশিক দৃষ্টিহীন। যাদবপুরের বাংলা বিভাগের এম এ পড়েছেন। তিনিও ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের সেরা ছাত্রী। অভাবের সংসার ওঁকেও রেখেছিল স্কুলের হোস্টেলে। তখন থেকেই মনেমনে প্রস্তুত হন যে কোনও ভাবেই হোক দৃষ্টিহীনতার সমস্ত বাধা তাঁকে পেরোতেই হবে। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই শুরু হয়ে যায় তাঁর লড়াই। খেলাধুলা, লেখাপড়া ছাড়াও কবিতা, নাচ, নাটক কোনও কিছুই তিনি বাদ দেননি। সেই নেশা তাঁকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখান থেকে দৃষ্টিহীনদের নিজস্ব নাট্যদলের আঙিনায়। এই দল গড়ার কাজে সুতপা প্রথমদিন থেকেই শুধুই অভিনয় করেনি, একজন লড়াকু নেত্রী হিসেবেও কাজ করে চলেছেন। এরই মধ্যে দৃষ্টিহীনদের অধিকার প্রসঙ্গে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন কাজ করে সুতপা তাঁদের সঙ্গেও হেঁটেছেন মিছিলে, মিটিংএ, পথসভায়। এখন তিনি বহু দৃষ্টিহীন মেয়েদের কাছে বিরাট আদর্শ, ভরসা। আর কেবল দৃষ্টিহীনদের কাছেই বা কেন? এমন অনেকেই আছে যারা অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই তাঁদের হার না মানার জেদ আর অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শুধু এগিয়ে চলছে না, অনেককে হারিয়ে দিচ্ছে। এগিয়ে চলেছে একটা নতুন সভ্যতার দিকে। যে সভ্যতায় রয়েছে আত্মসম্মান আর অধিকার বোধের যোগ্য মর্যাদা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওঁরা কিন্তু কখনও কোনও দিন, দৃষ্টিহীন বলে

নিজেদের খাটো করে ভাবেনি, আলাদা ভাবে কোনও সাহায্য চায়নি। সে কাজেই হোক, আর বিনোদনেই হোক। অর্থাৎ একটি অঙ্গের বৈকল্যযুক্ত বা আংশিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন নরনারীরা অনুভবের জগতে যে কোনো সম্পূর্ণ সুস্থ দেহমনের মানুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়,- তাদেরই জীবনচর্চার দলিল হয়ে উঠেছে এই সমস্ত নাটক।

উপসংহার

বাংলা নাটকে প্রতিবন্ধী চরিত্রের অবস্থান অন্বেষণের প্রচেষ্টায় যে ক্ষুদ্র গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা মূলত এমন কিছু বাংলা নাটক যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে, সেগুলির মধ্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি। প্রসঙ্গত, প্রতিবন্ধী চরিত্রের বিশেষত্ব, নাটকে তাঁর অভিনয়, বর্গীকরণ এবং বাস্তব ও নাটকের প্রতিবন্ধীর তুলনা আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা একটি ভূমিকা মাত্র। ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে একটি বিস্তৃত কাজ হতে পারে। আরো বিচিত্র দৃষ্টিকোণে একে আলোচনা করা যায়। প্রতিবন্ধী মানুষদের অবস্থান, তাদের বঞ্চনা-জীবন সংগ্রাম-সাফল্য সব কিছুকেই এই আলোচনায় রাখা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে যা প্রয়োজনীয় দলিল। নাটকে এই সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিকে কোথাও উপহাসের পাত্র বা হাস্যরসের উপদান হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা কতা হলেও নাটক কখনোই সমাজ বহির্ভূত নয়। বাস্তব ও সামাজিক জীবনে অবস্থানকারী এই সকল প্রতবন্ধীদের জীবনচিত্র-ই নাট্যকার নাটকের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অভিনেতারাও মঞ্চাভিনয়ের মুহূর্তে তাদের আঙ্গিক ও আচরণের মধ্যেদিয়ে নাট্যচরিত্রটিকে দর্শকদের কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে বারবার করে যে- পেশার সঙ্গে নেশার সংযোগ কোন না কোন দিক থেকে লক্ষ্য করা-ই যায়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় কোথাও থিয়েটারের মতো এমন আকর্ষনীয় মাধ্যম আজ কিন্তু নেই। অন্যসব ক্ষেত্রে সেটা দর্শকের কাছে পৌছাতে পারে নানান মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ সিনেমা এখন আমরা ইন্টারনেট বা টিভি যে কোন উপায়েই দেখতে পারি, গানও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে পাবার আশা করি কিন্তু থিয়েটার-ই এমন

একটা মাধ্যম যার একটা ভিডিও গ্রাফি হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু যে মুহূর্তে অভিনয়টা হচ্ছে তাতে যে উত্তেজনাটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে তৈরি হচ্ছে, সেটা যেমন বিদ্যুতের মতো দর্শকের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে- এর কোন বিকল্প দিক নেই।

নাটকে বা বাস্তবে যে সকল প্রতিবন্ধীদের দেখা যাচ্ছে তাদের সমাজ-সংসার-নির্বাসিত করে রাখা হয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার তেমন সৎ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয় না। এর প্রধান ও প্রথম কারণ অশিক্ষা ও কুসংস্কার। দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা যায়- তাদের সুস্থ করে তোলা যায় এমন বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রথম যুগে গ্রাম ও নগরের মানুষদের মধ্যে ছিল না। সন্তানের অঙ্গ বৈকল্যকে পিতামাতা গর্ভের কলঙ্ক বা পূর্ব জন্মের পাপের পরিণাম হিসেবে জ্ঞাত করত। দেবনারায়ণ গুপ্তের শ্যামলী নাটকের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় আছে। এদের মূলত জীবিকা নির্বাহ করতে হয় ভিক্ষে করে বা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে। কখনো এদের নিয়ে ভিক্ষা-ব্যবসা চালানো হয়, জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষদের এভাবেই দেখি- যারা রাস্তায় ভিক্ষে করে- অন্যের চ্যাঁই হিসেবে কাজ করে। সমাজ সচেতন নাট্যকারেরা এদের জীবন বেদনা প্রকাশ করেছেন নিপুণ ভাবে। বাংলা নাটকে প্রতিবন্ধীদের জীবনকথা চিত্রায়নের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নরনারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা সমাজের নানা স্তরে আলোচিত হয়ে থাকে। জনসংখ্যার নানা রিপোর্ট দেখেও আমরা বিস্মিত হতে থাকি- বিশ্বের নিরিখে, ভারতের নিরিখে এই প্রতিবন্ধকতা সম্বলিত নরনারীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে ১০,৫৮,৬৫৮ জন পুরুষ এবং ৭,৮৮,৪৮৯ জন নারী প্রতিবন্ধকতার শিকার। দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার শিকার ৮,৬২,০৭২ জন, মূক ১,৭০,০২২ জন, বধির ১,৩১,৫৭৯ জন। ইতিমধ্যে 'Disability Act 1995' গৃহীত হয়েছে। সরকারি ভাবে নানা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু অবস্থানে পৌঁছতে অনেক যন্ত্রনাময় পথ পেরোতে হয়েছে।

তাই আমরা বলতে পারি- নাটকের এই উপাদানগুলি প্রতিবন্ধী কল্যানের জন্য আবেগী উপকরণ ও অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়েছে। যারা প্রতিবন্ধকতার শিকার তারাও সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। নাটকে এই সব বিচিত্র প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশু, নর ও নারীদের জীবনযাপন চিত্রিত হয়েছে- সেগুলি বিশ্লেষন করে আমরা যে বিষয়গুলির দিকে আলোক সম্পাতনের চেষ্টা করেছি তা সূত্রাকারে এখানে উল্লেখ করছি-

প্রথমতঃ প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবন্ধকতা সমাজে নিন্দিত; আর প্রতিবন্ধকতার জন্য এই সব মানুষ অবহেলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা মুখ্যত সমাজের অভিশাপ। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, অষ্টাবক্র চরিত্রের কল্পনা-প্রতীক বা Symbolic নয়- এর মাধ্যমে বিশেষ সমাজ চারিত্র্য খুঁজে পাই।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবন্ধকতা বা Disability প্রধানত দুধরনের একটি জন্মগত অন্যটি অর্জিত। এই সব প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে সমাজে ও পরিবারে নানাভাবে শোষিত এবং অবহেলিত হয়। এদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নাট্যকার-পরিচালক তাদের আলোকিত করেছেন অসীম মমতায়।

তৃতীয়তঃ দৈহিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধী নরনারী অনেক ক্ষেত্রে পূণাঙ্গ মানুষদের থেকেও আলোকিত ও মানবিক গুন সম্পন্ন। তথাকথিত সুস্থ সকল নরনারীদের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি ‘অ-মানবিকতা’ কিন্তু প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আমরা দেখেছি নানা সুস্থ সুকুমার বৃত্তি। কোথাও কোথাও তাদের চারিত্র্যের নঞর্থকতার কারণ ও এই প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ দেহে বা মনে সে অপূর্ণ বলে তাঁর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে Negative Attitude.

চতুর্থতঃ একটি বিশেষ অঙ্গের বৈকল্য তাঁর অন্যান্য অঙ্গকে বিকল করে না। যে অন্ধ সে অনুভবে প্রখর, আর তার দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার অন্যদিকে রয়েছে সুতীব্র ঘ্রাণশক্তি- কেউ

ভালো গান গায়। কেউ জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের পথ খোঁজে। আবিষ্কার করে অন্যতর জীবন-দর্শন। বুঝিয়ে দেয়, একটি অঙ্গে বৈকল্য সত্ত্বেও সে পরিপূর্ণ মানবিকতা সম্পন্ন।

পঞ্চমতঃ প্রতিবন্ধকতার নানা বৈচিত্র্য এই উপাদানে বিশ্লেষিত হয়েছে। একটি বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই সব নরনারী সেই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সুস্থ জীবনের দিকে যেতে চলেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি এদের জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, চিকিৎসক, যাদের সহায়তায় এদের নতুন পথ দেখানো সম্ভব। অন্যদিকে সমাজে এদের প্রতি আচরণ ও সম্পর্কের নতুন আলো জ্বালালে, অদের সঠিক পুনর্বাসন দিলে, সমাজ ও দেশেরই মঙ্গল হতে পারে। শিশু সন্তানের জন্য অভিভাবকদেরও মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।

ষষ্ঠতঃ সরকারিভাবে আরো পদক্ষেপ প্রয়োজন। এগিয়ে আসতে হবে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদের। এদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ব্যাপারে আমাদের সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। সিনেমার মাধ্যমেও ব্যাপাক অনুপ্রেরণা যোগানো যেতে পারে। যেমন, সম্প্রতি ‘তারে জামিন পর’ সিনেমাটি সরকারকেও ভাবিয়েছে- ভাবিয়েছে শিক্ষাবিদদের।

সপ্তমতঃ সংবাদপত্রের মধ্যে, মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধী মানুষের সাফল্যের কথা আমাদের আশার আলো দেখায়। সব ধরনের অঙ্গ বৈকল্য বা মানসিক জড়তাকে জয় করার কথা আমরা বাস্তবেও দেখি। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, বিশ্ববিখ্যাত রমণী হেলেন কেলার, বা সাঁতারু মাসুদুর রহমান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক নাটকও বেশি করে নির্মিত হওয়া প্রয়োজন।

নবমতঃ উপহাসের বা পরিহাসের পাত্র হিসেবে নয়- তাদের প্রতি দয়া বা কারুণ্য নয়- ব্যক্তি মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, তাদের ‘এক তরণীর যাত্রী’ করে নেবার ব্যাপারে দরকার

নয়া দৃষ্টিভঙ্গী। চাই আরো বেশি অধিকার ও সুযোগ সুবিধা : এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অমিতাভ বন্দ্যোপাধায় মন্তব্য করেছেনঃ "আইনে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধীরা নাকি বিনা বাধায় বাসে, রেলে,পথে-ঘাটে,জাহাজে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারবে। অথচ তাদের জন্য এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তারা তাদের হুইল চেয়ারটুকু নিয়ে যেতে পারেন। সরকারি ভবন, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, প্রমোদ ভবন, সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট, রবীন্দ্রসদন, নন্দন, স্বভূমি কোথায় রয়েছে তাদের জন্য এ ব্যবস্থা ?" ('ওদের কথা ভাবুন।' সানন্দা। ১ ডিসেম্বর ২০০২), সত্যি করেই ওদের কথা ভাববার সময় এসেছে। বাংলা নাটকের প্রতিবন্ধী চরিত্রের জীবন এমন কথাই বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমার আলোচনা সমাজ নির্বাসিত এই সব প্রতিবন্ধী মানুষদের (যারা সত্যি করেই 'the most excluded in society') সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে যদি কণামাত্রও কাজে লাগে তবেই এই মানবিকী গবেষণা সফল ও সার্থক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

- জোছন দস্তিদার, দুই মহল, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ১৩৬৫
- দেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্যামলী, মন্ডল এন্ড সন্স পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১৬/বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৯, ১৩৯৪
- দেবনারায়ন গুপ্ত, সেকালের থিয়েটার ও বেশভূষা, নাট্যশোধ সংস্থান, কলকাতা-৯১, ২০০০
- নীহাররঞ্জন গুপ্ত, উল্কা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, ১৩৬৬
- বিজন ভট্টাচার্য, রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১৪১৫
- বাসবী রায় ও শুভ্র মজুমদার, নাটকের নানা রং, নাট্যশোধ সংস্থান, বিধান নগর, কোলকাতা-৯১, ২০১১
- বাসবী রায় ও শুভ্র মজুমদার, নাটকের নানা রং, নাট্যশোধ সংস্থান, সেক্টর ২ বিধাননগর, কলকাতা-৯১, ২০১৬
- মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪০০
- মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪১০
- মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৪২০
- রমন মহেশ্বরী, গ্রুপ থিয়েটার ২২ বর্ষ, সি এফ ২০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, ১৯৯৯

- রাজশেখর বসু, বাল্মীকি রামায়ণ,সারানুবাদ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ দশম মুদ্রণ, ১৩৯৬
- রাজশেখর বসু, মহাভারত,সারানুবাদ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ দশম মুদ্রণ, ১৩৯৪
- সুনীল দত্ত, রঙ্গব্যঙ্গের নাটক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ১৩৮১
- স্তানিসশ্লাভ্অস্কির, অভিনয় অভিনয়, গনমন প্রকাশক, ৩৩এ/১এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলকাতা-৫০, ১৯৯৩